শহীদ নূর হোসেন

শামসুর রাহমান
মতিউর রহমান

একজন নূর হোসেন। উদোম গা, জামাটা কোমরে বাঁধা। উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাত, বুকে-পিঠে লেখা—স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। গণতন্ত্রের মুক্তির মিছিলে শামিল হয়ে ঢাকার রাজপথে শহীদ হলেন তিনি। হয়ে উঠলেন গণতন্ত্রের লড়াইয়ের মহান প্রতীক। তাঁকে নিয়ে শামসুর রাহমান লিখলেন অমর কবিতা 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। কিন্তু কে এই নূর হোসেন? তৎকালীন *সাপ্তাহিক একতা*র সম্পাদক মতিউর রহমান দেখা পান নূর হোসেনের বাবা ট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমানের। জানলেন নূর হোসেন এবং তাঁদের পরিবারের কথা, তাঁদের জীবনসংগ্রাম ও দেশ নিয়ে প্রত্যাশার কথা। এই ইতিবৃত্ত এবং নূর হোসেনকে নিয়ে কবি শামসুর রাহমানের তিনটি কবিতার সম্মিলন এ বই।

Prothoma
201311000112
TK. 130.00

শামসুর রাহমান

জন্ম ২৩ অক্টোবর ১৯২৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (১৯৫৩)। পেশা ছিল সাংবাদিকতা; *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক ছিলেন। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-সমালোচনা-কলাম লিখেছেন, কিন্তু প্রধান অভিনিবেশ ছিল কবিতায়। বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত ও পাঠকনন্দিত কবি। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০)। পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আদমজী পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কারসহ বেশ কিছু স্বীকৃতি। সাংবাদিকতার জন্য পেয়েছেন জাপানের মিতসুবিশি পদক। মৃত্যু ১৭ আগস্ট ২০০৬, ঢাকায়।

মতিউর রহমান

জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৪৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর। সম্পাদক ছিলেন *সাপ্তাহিক একতা* ও *ভোরের কাগজ*-এর। বর্তমানে *প্রথম আলোর* সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *কার রাজনীতি কীসের রাজনীতি, ইতিহাসের সত্য সন্ধানে : বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি, ধনিকগোষ্ঠীর লুটপাটের কাহিনী, খোলা হাওয়া খোলা মন*। ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল যোগাযোগ'-এ ২০০৫ সালে পেয়েছেন র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

liberationwarbangladesh.org

শহীদ নূর হোসেন
গ্রন্থস্বত্ব : প্রথমা
প্রথম প্রথমা সংস্করণ : কার্তিক ১৪২০, নভেম্বর ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৩০ টাকা

Shahid Nur Hossain
by
Shamsur Rahman
Matiur Rahman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180078-81
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 130 only

ISBN 978 984 90255 7 3

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭	মতিউর রহমান
আমাদের গর্ব	১১	কাইয়ুম চৌধুরী
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়	১৫	শামসুর রাহমান
শহীদ নূর হোসেন, বৃদ্ধ মজিবুর রহমান এবং শামসুর রাহমানের কবিতা	১৯	মতিউর রহমান
একজন শহীদের মা বলছেন	২৬	শামসুর রাহমান
১০ নভেম্বরে শহীদের পিতার জিজ্ঞাসা	৩০	মতিউর রহমান
আলো-ঝরানো ডানা	৩৮	শামসুর রাহমান
শহীদ নূর হোসেনের পিতার আশাবাদ	৪৩	মতিউর রহমান
'তার বুকে-পিঠে লেখা ছিল, সেগুলো ঘইষ্যা তুলতে পারি নাই'	৫০	মতিউর রহমান
শহীদ নূর হোসেনের পিতার মৃত্যুর পর কিছু কথা	৫৪	মতিউর রহমান

পরিশিষ্ট

নূর হোসেনের পিতার বেঁচে থাকাই দায়	৬২

ভূমিকা

নূর হোসেন, শহীদ নূর হোসেনকে আমরা কতটুকু মনে রেখেছি?

সেই ২৪ বছরের যুবক ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন-সমাবেশে উদোম গায়ে বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' আর 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে উত্তাল মিছিলের সামনে ছিলেন। সেই সকালে সচিবালয়ের পাশের রাস্তায় পুলিশের লক্ষ্যভেদী বুলেট বিদীর্ণ করে নূর হোসেনের শরীর। কবি শামসুর রাহমান যাকে বলেছিলেন 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'।

শহীদ নূর হোসেন গণতন্ত্রের লড়াইয়ে এক মহান প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তখন। তাঁর সেই ছবি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়ে যায়। তারপর বছরের পর বছর, প্রায় এক যুগ ধরে নূর হোসেনের আত্মত্যাগ দেশবাসীকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছে, প্রভাবিত করেছে। সেই দিনগুলোয় অনেক সভা-সমাবেশ হয়েছে। অনেক কবিতা, অনেক লেখালেখি হয়েছে নূর হোসেনকে নিয়ে। তাঁর বাসস্থান, তাঁর পরিবারের কথা মানুষ জেনেছে। অনেক খ্যাতিমান মানুষও তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন। নূর হোসেনের বেবিট্যাক্সিচালক পিতা মজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন সবিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। সেই দিনগুলোয় ছোট-বড় অনেক সমাবেশ হয়েছে তাঁকে নিয়ে।

একদিন মজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার আকস্মিক পরিচয় হয় তাঁরই বেবিট্যাক্সিতে যেতে যেতে। তারপর সেই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং সহজেই তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে মিলেমিশে যাই। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে দেখা হতে থাকে মজিবুর রহমানের সঙ্গে।

কথোপকথনের ভেতর থেকে তাঁর জীবনসংগ্রামের নানা কাহিনি আর দারুণ অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সেই সুবাদে মজিবুর রহমানের পরিবারের সুখে-দুঃখে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি। সেই যোগাযোগ নূর হোসেনের ছোট বোন সাহানার মাধ্যমে এখনো আছে। শহীদ নূর হোসেন ও তাঁর পরিবারের কথা ব্যস্ত সময়েও মনে হয়। তার পরও প্রশ্ন জাগে, সত্যি আমরা কতটুকু মনে রেখেছি শহীদ নূর হোসেনকে?

নূর হোসেনের মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, কবি, লেখকসহ নানা শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক মানুষকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। সে বছরেরই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে *সাপ্তাহিক একতা*র বিশেষ সংখ্যার জন্য নূর হোসেনের আত্মদান নিয়ে কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। এ এক অমর কবিতা। পরে এই কবিতার নামানুসারে কবি একটি বইয়ের নামকরণও করেন। একই বছরের বিজয় দিবসে নূর হোসেনকে নিয়ে শামসুর রাহমানের আরেকটি কবিতা 'একজন শহীদের মা বলছেন' প্রকাশিত হয়েছিল *সাপ্তাহিক দেশবন্ধু* পত্রিকায়। আর, ১৯৮৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর নূর হোসেনকে নিয়ে 'আলো-ঝরানো ডানা' নামে *সাপ্তাহিক একতায়* কবি শামসুর রাহমানের আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

আশির দশকের সেই সব উত্তাল দিনে একজন রাজনৈতিক ও সংবাদকর্মী হিসেবে আমি ছিলাম সক্রিয়। সে সময়ই পরিচয় হয় মজিবুর রহমানের সঙ্গে। তারপর সেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং আমরা অনেক কাছাকাছি চলে আসি। সেই সব ঘটনাপ্রবাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লিখি 'শহীদ নূর হোসেন, বৃদ্ধ মজিবুর রহমান ও শামসুর রাহমানের কবিতা', যা *দৈনিক সংবাদ*-এ (৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮) প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর *সংবাদ*-এ প্রকাশিত হয় আরেকটি লেখা '১০ নভেম্বরে শহীদের পিতার জিজ্ঞাসা'। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর একই পত্রিকায় আবারও লিখি 'শহীদ নূর হোসেনের পিতার আশাবাদ'। সব কটি লেখা শহীদ নূর হোসেন, তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবার নিয়ে।

শহীদ নূর হোসেন ও তাঁর পিতার প্রতি গভীর আবেগ থেকে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কবি শামসুর রাহমানের তিনটি কবিতা ও আমার

তিনটি নিবন্ধ নিয়ে বের হয়েছিল *শহীদ নূর হোসেন* নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটি বই। বইটির জন্য ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। এর প্রচ্ছদ আর ভেতরের সব স্কেচ-ড্রয়িংও ছিল তাঁরই আঁকা। প্রকাশক ছিলেন মালেকা বেগম, জ্ঞান প্রকাশনী। বইটি ওই সময় প্রচার পায়নি। চেষ্টাও তেমন করিনি।

নব্বইয়ের পর দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এ লিখেছি। মজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর লিখেছি *প্রথম আলোয়*। তার পরও বেশ কয়েকটি বছর চলে গেল। সেই ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ *শহীদ নূর হোসেন*-এর নতুন একটি সংস্করণ বের করার কথা ভেবেছি অনেক দিন। বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলাম দু-তিন বছর ধরে। শেষ পর্যন্ত এবার বের করব বলে সিদ্ধান্ত নিই। বইটি বের হলো ১০ নভেম্বর, যেদিন মজিবুর রহমানের বীর সন্তান নূর হোসেন শহীদ হয়েছিলেন। বইটির নতুন সংস্করণ বের করার স্বপ্ন এবার পূরণ হলো। সঙ্গে আমার আরও দুটি লেখা-প্রতিবেদনও যুক্ত হলো। আর নূর হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর বুকে-পিঠের স্লোগানে বানান ভুল থাকা সত্ত্বেও তা অবিকৃত রাখা হলো।

নতুন করে প্রকাশিত *শহীদ নূর হোসেন* গ্রন্থটি যদি এই সময়ের তরুণ প্রজন্মকে কিছুটা হলেও উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে সার্থক মনে হবে আমাদের প্রচেষ্টা। আর যদি কোনো তরুণ লেখক বা নাট্যকার নূর হোসেনকে নিয়ে কিছু ভাবেন, তাহলে কৃতজ্ঞ হব। আমরা পাশে থাকব।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী আবারও নতুন কিছু ড্রয়িং করে দিলেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। শিল্পী অশোক কর্মকার আর দুই তরুণ বন্ধু সালাহ্ উদ্দিন ও সাদীকে বিশেষ ধন্যবাদ।

শত ব্যস্ততার মধ্যে নানা সময়ে শহীদ নূর হোসেনের পিতা ও তাঁর পরিবারের কথা মনে পড়ে। এ বইয়ের মাধ্যমে শহীদ নূর হোসেন, তাঁর পিতা মজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে আমরা স্মরণ করছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মতিউর রহমান
ঢাকা, ১০ নভেম্বর ২০১৩

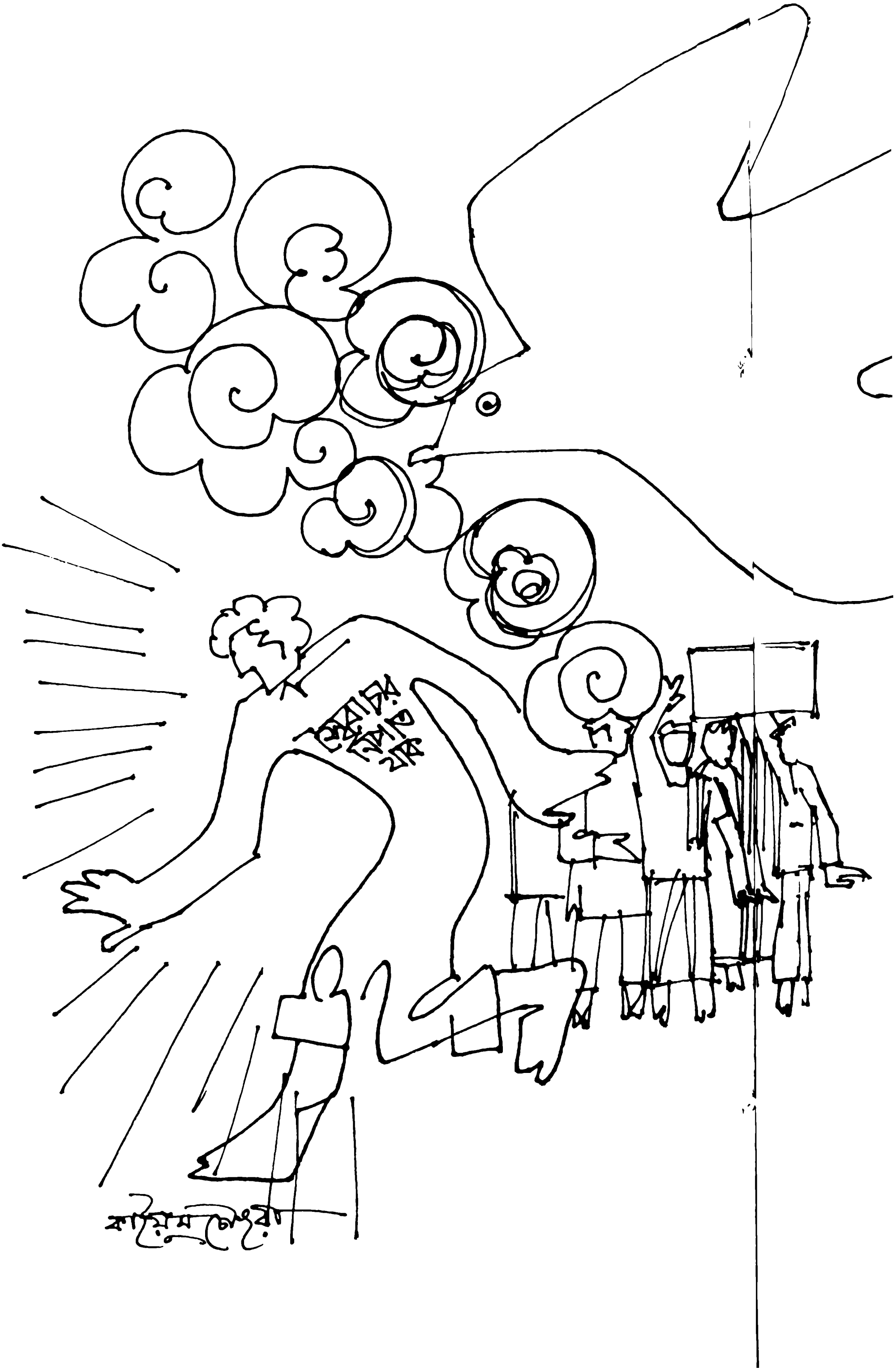
স্বৈরাচার নিপাত যাক
কাইয়ুম চৌধুরী

আমাদের গর্ব

বুক ভরে মাটির গন্ধ নেওয়ার জন্য, উদাত্ত কণ্ঠে গান গাওয়ার জন্য, ক্যানভাসে স্বপ্নের ছবি আঁকার জন্য, কবিতায় জীবনের ফুল ফোটানোর জন্য রাজপথে নেমে এসেছিলেন যে তরুণ, বুকের রক্তে লিখে রেখে গেলেন মানবতার শত্রু 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক'। যে দেশে মানবতা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয় প্রতিনিয়ত, সে দেশে এই আত্মদান আমাকে বিমূঢ় করে। গর্বিত হই অন্তরে, উজ্জীবিত হই প্রাণে। মনে পড়ে, ফরাসি বিপ্লবের ওপরে আঁকা ইউজিন দেলাক্রোয়ার ছবি 'জনগণের নেতৃত্বে স্বাধীনতা'। স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে নারী জাতির একজনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের পতাকা হাতে বাংলাদেশে এগিয়ে এসেছিলেন একজন নূর হোসেন। নূর হোসেনের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দেলাক্রোয়ার অমর তুলিকা হস্তে কেউ কি এগিয়ে আসবেন? ভবিষ্যতে?

কাইয়ুম চৌধুরী

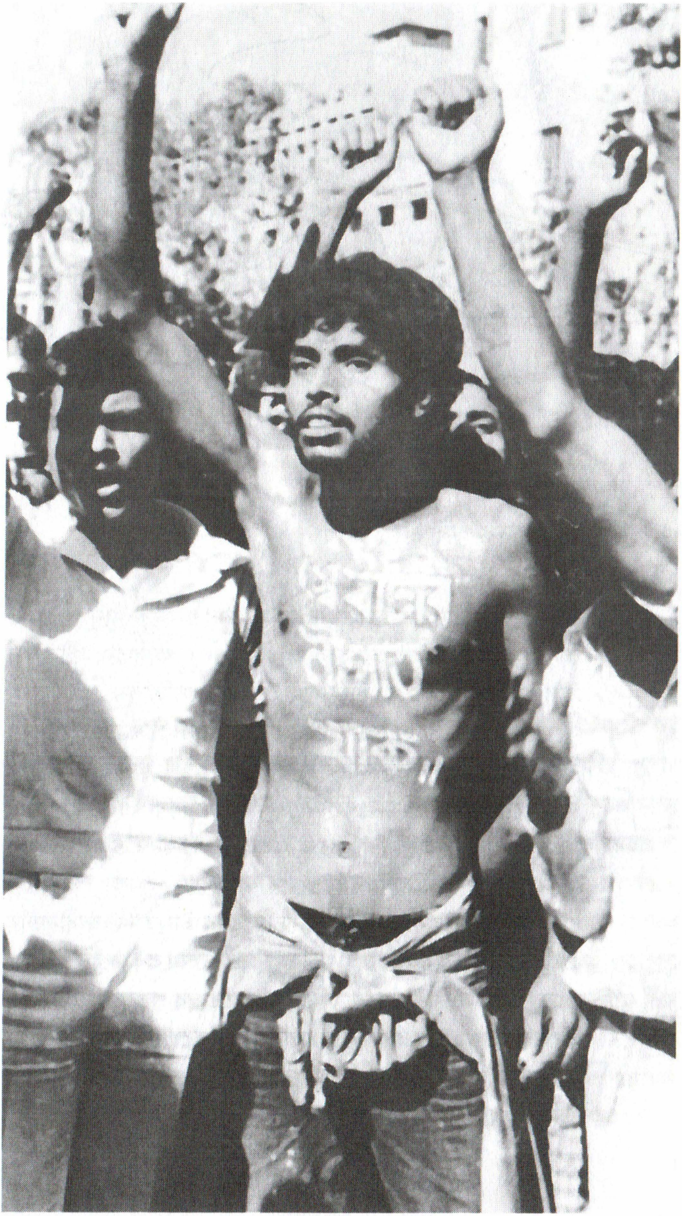

ছবি : সংগৃহীত

ছবি : পাভেল রহমান

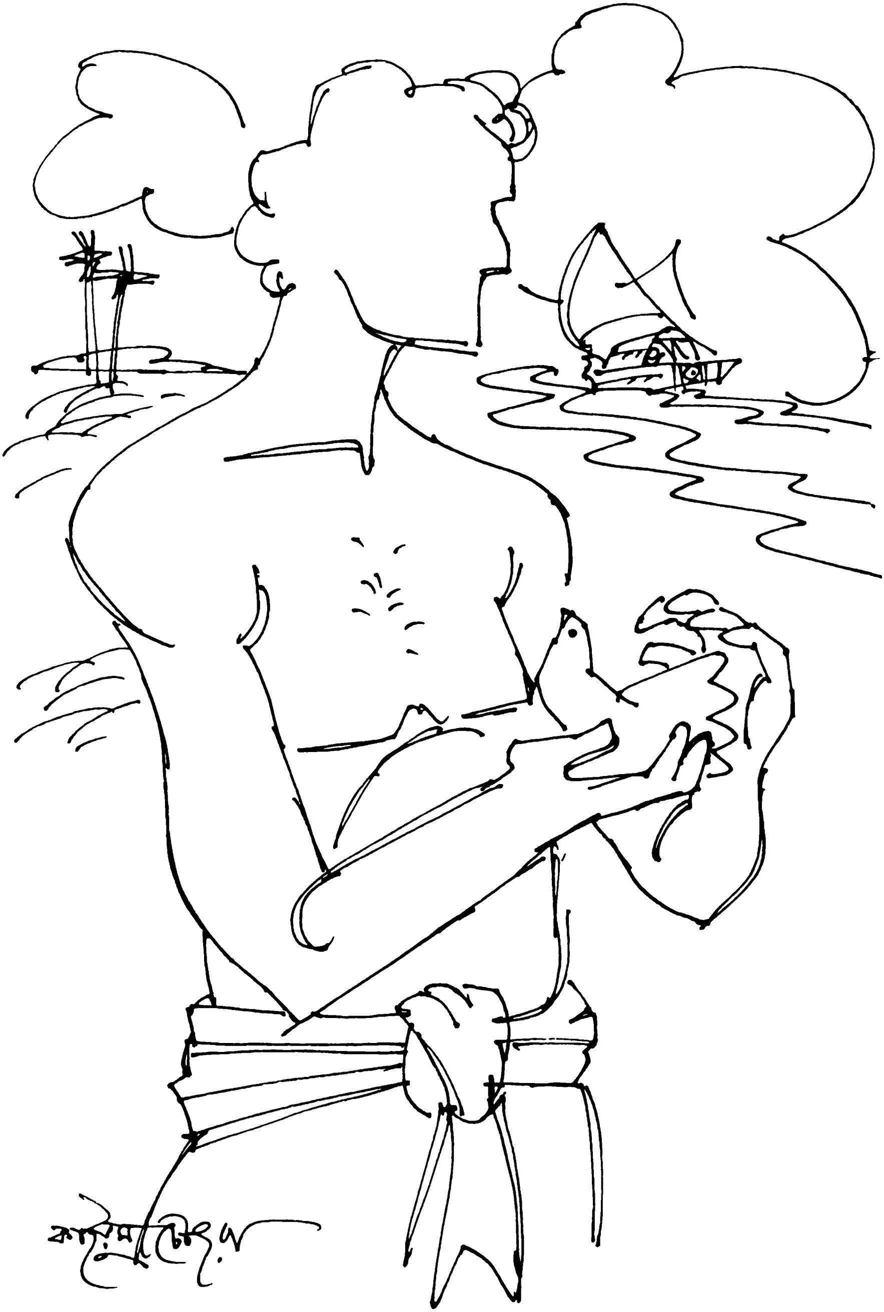

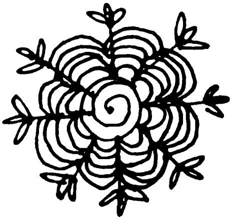

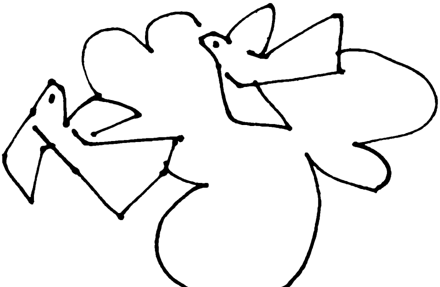

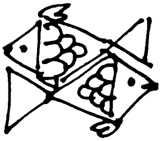

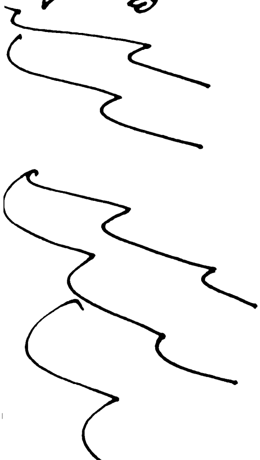

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

শামসুর রাহমান

সারারাত নূর হোসেনের চোখে এক ফোঁটা ঘুমও
শিশিরের মতো
জমেনি, বরং তার শিরায় শিরায়
জ্বলেছে আতশবাজি সারারাত, কী এক ভীষণ
বিস্ফোরণ সারারাত জাগিয়ে রেখেছে
ওকে, ওর বুকে ঘন ঘন হরিণের লাফ,
কখনো অত্যন্ত ক্ষিপ্র জাগুয়ার তাকে
প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে জ্বলজ্বলে
চোখে খর তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে,
এতটুকু ঘুমোতে দেয়নি।

কাল রাত ঢাকা ছিলো প্রেতের নগরী,
সবাই ফিরেছে ঘরে সাত তাড়াতাড়ি। চতুর্দিকে
নিস্তব্ধতা ওঁৎ পেতে থাকে,
ছায়ার ভেতরে ছায়া, আতঙ্ক একটি
কৃষ্ণাঙ্গ চাদরে মুড়ে দিয়েছে শহরটিকে আপাদমস্তক।
মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক নৈঃসঙ্গ্যকে।

আরো বেশি তীব্র ক'রে তোলে
প্রহরে প্রহরে, নূর হোসেনের চোখে
খোলা পথ ওর
মোহন নগ্নতা নিয়ে আমন্ত্রণ জানায় দুর্বার। অন্ধকার
ঘরে চোখ দুটো অগ্নিঘেরা
জানালা, কব্জিতে তার দপদপ করে ভবিষ্যত।

এমন সকাল তার জীবনে আসেনি কোনোদিন,
মনে হয় ওর; জানালার কাছে পাখি
এরকম সুর
দেয়নি ঝরিয়ে এর আগে, ডালিমের
গাছে পাতাগুলি আগে এমন সতেজ
কখনো হয়নি মনে। জীবনানন্দের
কবিতার মায়াবী আঙুল
তার মনে বিলি কেটে দেয়। অপরূপ সূর্যোদয়,

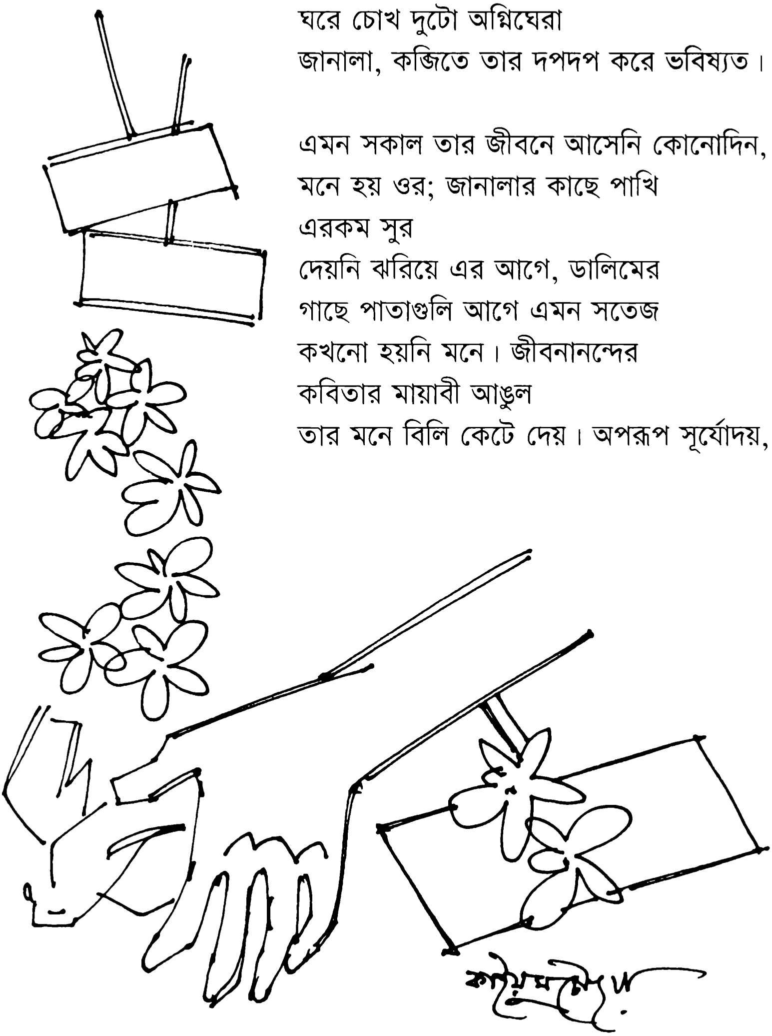

কেমন আলাদা,
সবার অলক্ষ্যে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে
আঁকা হ'য়ে যায়,
যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গনে।

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো ক'রে দেয়; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার
বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।

প্রকাশকাল : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭, *সাপ্তাহিক একতা*

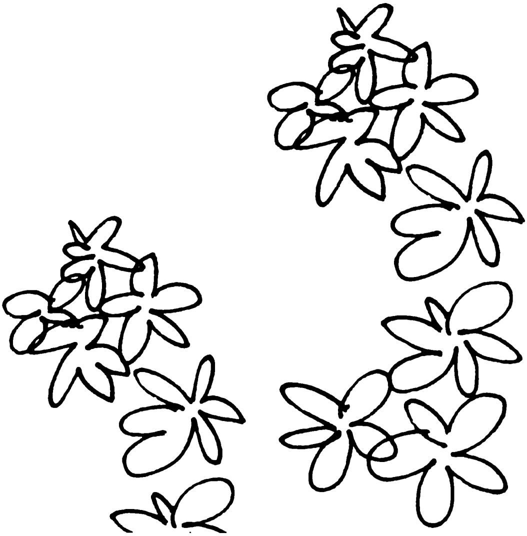

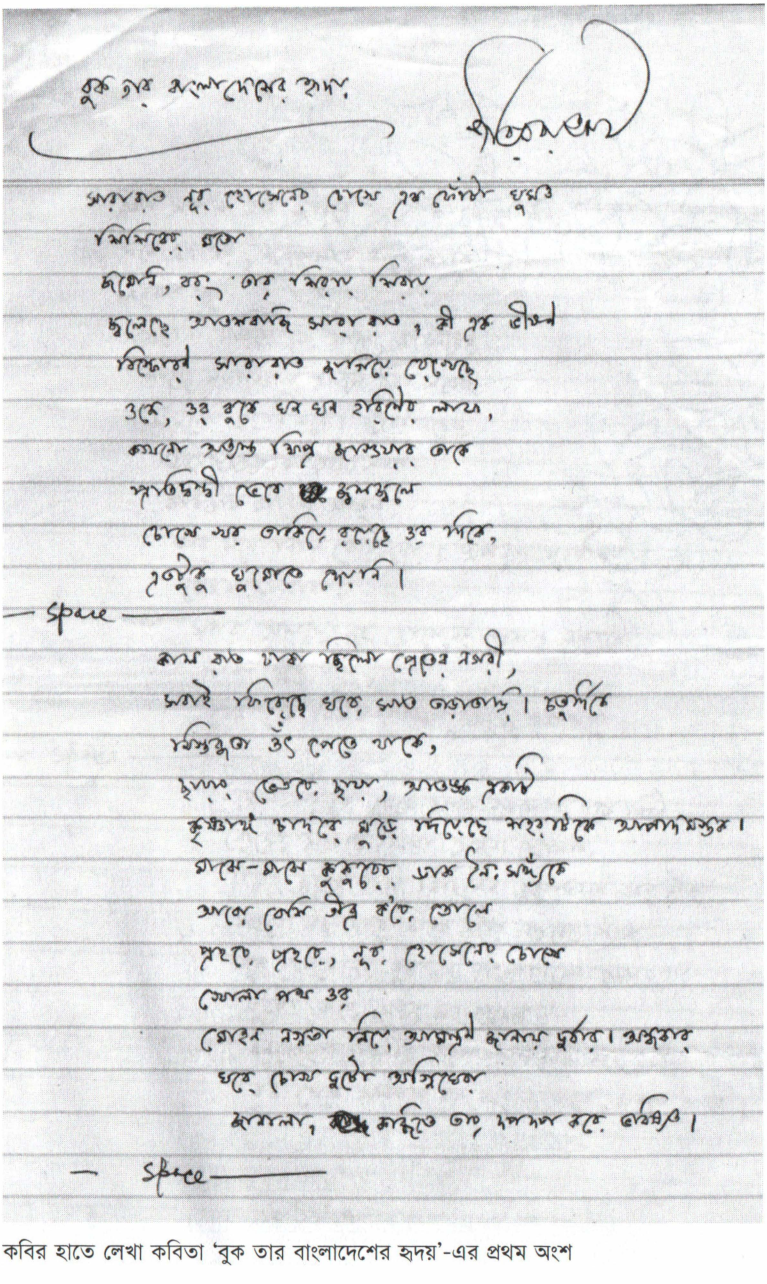

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

শামসুর রাহমান

সারারাত নূর হোসেনের চোখে এক ফোঁটা ঘুমও
শিশিরের মতো
জমেনি, বরং তার শিরায় শিরায়
জ্বলেছে আতশবাজি সারারাত, কী এক ভীষণ
বিস্ফোরণ সারারাত জাগিয়ে রেখেছে
ওকে, ওর বুকে ঘন ঘন হরিণের লাফ,
কখনো অত্যন্ত নিঝুম সরোবর ওকে
প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে জ্বলজ্বলে
চোখে সব জোনাকি রয়েছে ওর দিকে,
একটুকু ঘুমোতে দেয়নি।

— Space —

কাল রাত ঢাকা ছিল প্রেতের নগরী,
সবাই ফিরেছে ঘরে, সাত তাড়াতাড়ি। চতুর্দিকে
নিস্তব্ধতা ওৎ পেতে থাকে,
[illegible], [illegible], ছায়া, আতঙ্ক একটি
কৃষ্ণপক্ষ চাঁদকে মুড়ে দিয়েছে শহরটিকে আপাদমস্তক।
মাঝে-মধ্যে কুকুরের ডাক নিঃসঙ্গতাকে
আরো বেশি তীব্র করে তোলে
প্রহরে প্রহরে, নূর হোসেনের চোখে
খোলা পথ ওর
যেমন নগ্নতা দিলে, আসন্ন জনতায় দুর্বার। অন্ধকার
ঘরে চোখ দুটো জ্বলছে
জানালা, কাছিতে তার, দপদপ করে নক্ষত্র।

— Space —

কবির হাতে লেখা কবিতা 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'-এর প্রথম অংশ

শহীদ নূর হোসেন, বৃদ্ধ মজিবুর রহমান এবং শামসুর রাহমানের কবিতা

মতিউর রহমান

কবি আর কবিতার প্রতি ভালোবাসা, অনুপ্রাণিত আকর্ষণ সব সময়েরই সঙ্গী আমার। এক সময়ে, ষাটের দশকের শুরু থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কাল পর্যন্ত কবিতাচর্চায় বেশ নিমগ্ন সময় কেটেছিল। এর পরও কোনো কোনো সময় হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো কবিতার রাজ্যে ফিরে গেলেও তা কখনোই ষাটের দশকের সেই দিনগুলোর মতো উজ্জ্বল হয়নি। তা ছাড়া ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির কার্জন হলের অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার সামনে কবিতা পাঠের মতো সাহস প্রদর্শনের সুযোগও আসেনি কোনো দিন। তবে কবি আর কবিতার রাজ্যে বিচরণ আজও অব্যাহত রয়েছে।

সেদিন, ২০ জানুয়ারি সকালে, নিজ বাসগৃহের ছোট্ট বারান্দায় হঠাৎ যে অনিন্দ্য কাব্যিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তা আগামী দিনগুলোর জন্য মধুর এক স্মৃতি হয়ে থাকবে। শ্রোতা তিনজন। বৃদ্ধ মজিবুর রহমান, বন্ধু অজয় দাশগুপ্ত এবং আমার পুত্র শৈশব আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণের সাশা (মাহমুদুর রহমান)। অনভ্যস্ত ও অপরিশীলিত কণ্ঠে পাঠ করছি *সাপ্তাহিক একতা* থেকে আজকের

বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের কবিতা 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। আবৃত্তি নয়, বিলম্বিত তালে ধীরে ধীরে পড়ছি। শ্রোতা তিনজন গভীর মগ্নতায় শুনছেন।

কবিতা পাঠ চলছে, কবিতার কথা, ভাষা আর ভাবে বৃদ্ধ মজিবুর রহমানের দুচোখ সজল হয়ে উঠছে। কবিতা পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধশ্বাস দমন করে, অশ্রুভরা দুচোখ নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বৃদ্ধ মজিবুর রহমান বলতে থাকলেন, বারবার বলতে থাকলেন 'ধন্য কবি', 'ধন্য কবি'। তিনি চোখ মুছছেন দুহাতে, আর বুক ফাটা আর্তনাদ চেপে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলছেন 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক'। গণতন্ত্র যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলছেন, 'আমি দোয়া করছি ২২ দলের ঐক্য টিকে থাকুক। মানুষের মঙ্গল হোক।' সবার চোখ তখন সজল। অশ্রুধারা রুখতে সবারই চলছে কষ্টপ্রয়াস। পুত্র হারানোর শোকে বিহ্বল পিতা, আর উপস্থিত সবাই গভীরভাবে আলোড়িত, অনুপ্রাণিত। এমন সুন্দর এক মহতী পরিবেশ জীবনে কতবার আসে?

বৃদ্ধ মজিবুর রহমানের সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটিও বড় বেদনাদায়ক। ২৮ নভেম্বর (১৯৮৭ সাল) উয়ারী থেকে বেবিট্যাক্সিতে করে মণিপুরিপাড়ায় শিল্পী কামরুল হাসানের বাসা হয়ে বংশালের দিকে রওনা দিয়েছি। বেবিট্যাক্সি ইন্দিরা রোড হয়ে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছে। এমন সময় বৃদ্ধ ট্যাক্সিচালক চকিতে পেছন ফিরে বললেন, 'আমি আপনাকে চিনি। আপনি পত্রিকার লোক। আর আমি শহীদ নূর হোসেনের বাবা।' আমি চমকে উঠলাম। বেবিট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমান নানা কথা বলছেন। আমি নির্বাক আর অভিভূত। লজ্জায় কুণ্ঠিত। মজিবুর রহমান তাঁর সন্তান নূর হোসেনের একটি ফটো চাইলেন, তিনি সেটাকে বাঁধিয়ে রাখতে চান। গন্তব্যস্থল বংশালে নেমে লজ্জিত বিমূঢ়তা কাটিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম। ভাবলাম, আমরা শহীদদের কথা বলি, তাঁদের নামে শপথ নিই, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে, তাঁদের পরিবার সম্পর্কে কতটুকু জানি?

সাতাশির ১০ নভেম্বরে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় পুলিশের গুলিতে নিহত, সাহসী যুবক, শহীদ নূর হোসেনের জনক মজিবুর রহমান। বয়স তাঁর ষাট বছর। থাকেন পুরান ঢাকার বনগ্রামে এক ঘরের একটি বাসায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরেই তিনি আছেন ওই একই গৃহে। স্ত্রী ছাড়া চার পুত্র আর এক কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। দ্বিতীয় সন্তান নূর হোসেন (২৪) নেই। আছেন প্রথম সন্তান আলী হোসেন (২৭) মিনি ট্রাক ড্রাইভার। দেলোয়ার (২২) মিনিবাসের হেলপার। আনোয়ার (১৮) লেদ মেশিনে কাজ শিখছেন। একমাত্র মেয়ে সাহানা (১৪) স্কুলে পড়ে অষ্টম শ্রেণীতে।

মজিবুর রহমানের পরিবারের কর্মক্ষম সব সদস্যই মেহনত করেন, উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বলতে গেলে, বাংলাদেশের লাখো-কোটি শ্রমজীবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সত্যিকার অর্থেই একটি প্রতিনিধিত্বশীল পরিবার-গোষ্ঠী তাঁরা। মজিবুর রহমান সেই কোন যৌবনকালে ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় এসেছিলেন বরিশালের মঠবাড়িয়ার ঝাটিবুনিয়া গ্রাম থেকে। ঢাকা-জীবনের শুরুতে তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে মসলা পেষার কাজ করেছেন। পরে সেখানেই পেয়েছেন সিক বয় ডিউটির কাজ। একই হোস্টেলে বাবুর্চির কাজ করেছেন অনেক দিন। ওই কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর রিকশা চালিয়েছেন আট বছর।

১৯৬২ সাল থেকে বেবিট্যাক্সি চালাচ্ছেন তিনি। সে সময় দৈনিক জমা ছিল দশ টাকা। একাত্তর সালে বেবিট্যাক্সির দৈনিক জমা বেড়ে হয়েছিল ষোলো টাকা। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় তা নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দশ টাকায়। আবার ১৯৭২ সালেই বেড়ে যায় বাইশ টাকায়। তার পর থেকে দৈনিক জমার পরিমাণের ঊর্ধ্বগতি আর থামেনি। ক্রমেই তা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। ১৯৭৫ সালে পঁয়ত্রিশ টাকা, '৭৭ সালে পঁয়তাল্লিশ টাকা, '৭৯ সালে পঞ্চান্ন টাকা, '৮২ সালে পঁয়ষট্টি টাকা হয়েছিল। এখন মজিবুর রহমান বেবিট্যাক্সির মালিককে দৈনিক জমা দেন ১৩৫ টাকা।

পঞ্চান্ন বছর বয়স মজিবুর রহমানের। গ্রীষ্ম-শীত-বর্ষা সব ধরনের আবহাওয়ায় সারা দিন খাটুনির পর মালিকের জমা ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে হাতে পান ১০০ টাকা বা তার চেয়ে কিছু বেশি। এই আয়ের সঙ্গে বড় সন্তান আলী হোসেন দৈনিক ১০০ টাকা বা তার চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে সংসারের খরচে সাহায্য করেন। শহীদ নূর হোসেন সাহায্য করতেন দৈনিক ৮০-৯০ টাকা। এভাবেই এই আয় থেকে টানাটানির মধ্য দিয়ে তাঁদের সংসার চলে যেত।

এখন নূর হোসেনের দৈনিক আয় আর আসে না। কোনো দিন তা আর আসবে না। সে জন্য মজিবুর রহমানের কোনো আপসোস নেই। কোনো দুঃখ নেই। কারণ, তাঁর ছেলে নূর হোসেন 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' দাবিতে শহীদ হয়েছেন। সারা দেশের মানুষ তাঁকে চিনেছে। শহীদের সম্মান দিয়েছে। আর এভাবে তাঁকে, মজিবুর রহমানকেও দেশের মানুষ চিনেছে। সব মানুষের স্নেহ আর ভালোবাসা তিনি পাচ্ছেন। এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। তিনি দেশের এবং সব মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। সে জন্য তিনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

দেশ ও দেশের মানুষের জন্য মজিবুর রহমানের এই ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনারও সুদীর্ঘ অতীত আছে। তাঁর এই মানবকল্যাণ বোধ গড়ে ওঠার ইতিহাসও বাংলাদেশের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের ঘটনাবলির সঙ্গে রয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সব আন্দোলনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনের তিনি একজন সজাগ সাক্ষী।

১৯৫২ সালে যেদিন মজিবুর রহমান তাঁর নিজ গ্রাম ঝাটিবুনিয়া ছেড়ে লঞ্চে ঢাকার সদরঘাটে পৌঁছেন, সেদিন ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, ঢাকা নগরকে কালো অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ঘাটের মানুষ তাঁকে শহরে যেতে দেয়নি। কারণ, শহরের অবস্থা ভালো ছিল না। মজিবুর

রহমান বলেন, সে সময় ঢাকার মানুষের মনে যতটা দরদ আর মায়া-মমতা ছিল, এখন তেমনটি নেই।

১৯৫২ থেকে '৫৪ সালের ঢাকার বুকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির উত্থান-পতনকে যৌবনের বিস্ময়ভরা চোখে দেখেছেন মজিবুর রহমান। মুসলিম লীগ সরকারের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার আর নির্যাতন তাঁকে বিদ্রোহী করেছে। '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় নবাবপুর রোডে শেরেবাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিরোধীদলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আওয়ামী লীগের প্রতি আস্থাশীল হয়েছেন। পল্টন ময়দানে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আলতাফ মাহমুদের কণ্ঠে 'ও বাঙালি, ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' গানটি শুনে চোখের পানি ঝর ঝর করে পড়েছে তাঁর। কেঁদে আকুল হয়েছেন মজিবুর রহমান।

এ সময়ের পর থেকে মজিবুর রহমান জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের এবং আওয়ামী লীগের সব কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এভাবে পুরো ষাটের দশকে তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর খুব দুঃখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তিনি শুনতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে বেবিট্যাক্সিতে করে ভাড়ার বিনিময়ে একজনের লাশ গাজীপুরের বর্মি বাজারে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ফিরতে তাঁর রাত নয়টা বেজে গিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের কারফিউ প্রত্যাহার করা হলে বিক্রমপুরে চলে গিয়েছিলেন মজিবুর রহমান। কিন্তু পেটের দায়, সংসারের মায়ায় কদিন পরই আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। বাসে টিকাটুলীতে নেমে ঢাকা শহরকে তাঁর 'রাক্ষসের দেশ' বলে মনে হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে মজিবুর রহমান এক ভীতসন্ত্রস্ত পরিস্থিতিতে ঢাকায় বাস করেছেন। বেবিট্যাক্সি চালিয়েছেন। রাজাকারদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন। একবার লালকুঠিতে, আরেকবার সায়েদাবাদে পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল।

মহান স্বাধীনতা মজিবুর রহমানের মনে নতুন আশা সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর। খুশিতে চলছিলেন তিনি। দেশের মঙ্গল হবে, এমন আস্থা তাঁর ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করে। তাঁকে হত্যার পর আওয়ামী লীগের কেউ প্রতিবাদ করে দাঁড়ায়নি। এতে তাঁর মন ছোট হয়ে যায়।

এ রকম অবস্থায় তিনি স্থির করেন, যাঁকে ভালো লাগবে তাঁকে ভোট দেবেন। জিয়াউর রহমানকে ভালো লেগেছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। সাধারণ মানুষের মাঝে গেছেন। সে জন্য নির্বাচনে তাঁকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারেননি। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি পছন্দ করতে পারেননি।

দেশ আর জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তারা। আজ বাঙালির বুক ফুটো করেছে বাঙালিরাই। সে জন্য বিগত নির্বাচনে সরকারের পক্ষে তিনি ভোট দেননি। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তাঁর ছেলে নূর হোসেনের মহান আত্মদান সম্পর্কে মজিবুর রহমান সজল চোখে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আমি কোনো সাহায্য চাই না। আমি চাই ২২ দলের মধ্যে ঐক্য থাকুক। এর জন্য আমি সব সময় দোয়া করি। প্রতিটি দলই আমার দল। আমার পার্টি বলে কোনো কথা নেই। ভাগাভাগি নেই। আমার ছেলে গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছে, অন্য আরও পিতামাতার ছেলেরাও শহীদ হয়েছে। তারা গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছে। গণতন্ত্র আসুক এ দেশে। মঙ্গল হোক মানুষের। এটাই আমার কামনা। এ জন্যই আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি।'

মজিবুর রহমান ছত্রিশ বছর ধরে ঢাকায় থেকে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে, তিন দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছেন। কখনোই কারও দ্বারে, কোনো দলের কাছে সাহায্য নিতে বা কোনো সুবিধার জন্য হাত পাতেননি। এটা তাঁর জন্য

এক বড় গর্ব। তাঁর পুত্র নূর হোসেনের মহান আত্মত্যাগ বেবিট্যাক্সিচালক পিতার মনকে আরও শক্ত করেছে। পুত্র হারানোর শোকে গভীরভাবে ব্যথিত, কিন্তু আশাবাদ তাঁকে আরও দৃঢ় করেছে। দেশের মঙ্গলচিন্তা তাঁকে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছে।

এভাবেই বিগত তিন-চার দশকের শত সংগ্রামে পোড়খাওয়া এক প্রবীণ প্রজন্ম বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, শ্রমিক বস্তিতে, খেতমজুরের আস্তানায় গড়ে উঠেছে। সারা দেশে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতে এই কয়েক দশকের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নূর হোসেনের মতো সাহসী এবং আত্মত্যাগে উন্মুখ এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এভাবেই মেহনতী মানুষের সংগ্রাম আর আত্মত্যাগ গভীরভাবে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করছে শামসুর রাহমানের মতো আরও অনেক প্রবীণ-নবীন কবি আর চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, নাট্য ও কণ্ঠশিল্পী এবং নানা পেশার মানুষকে। এসব ছোট-বড় সব স্রোতধারা মিলেমিশে এক উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টির আয়োজন চলেছে বাংলাদেশে, প্রকাশ্যে এবং অলক্ষ্যে।

প্রকাশকাল : ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮, *দৈনিক সংবাদ*

একজন শহীদের মা বলছেন

শামসুর রাহমান

যাকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছি, এখন
সে কোথায়? পুড়িয়ে আমার বুক এই
পোড়া দেশটিকে ভালোবেসে,
ভালোবেসে শাপলা-শালুক, খালবিল, মাছরাঙা
সোমত্ত নদীর বাঁক, দোয়েলের শিস,
দিগন্ত সবুজ-করা টিয়েদের ঝাঁক,
যৌবনের প্রফুল্ল সকালে
ঝরে গ্যাছে। এখন কোথায় ওর হাড়গোড় সার
হচ্ছে ক্ষেতে স্বপ্নময় শস্য হবে বলে
আমি তা জানি না।

সময় কাটতো ওর রাশি রাশি বই পড়ে, খুব
রাত করে ঘুমোতো সে, কখনো কখনো
কণ্ঠে ওর নক্ষত্রের মতো
ফুটতো কী সব কথা, যা ছিলো আমার
বোধের ওপারে। বলতো সে
মাঝে মাঝে, 'রাতে স্বপ্নে দেখি
ফুটেছে গোলাপ এক বুকের ভেতরে
মা, তোমার মমতার মতো। তোমার মুখেই দেখি
প্রতিদিন স্বদেশের মুখ এবং যখন তুমি
ঘর ঝাঁট দাও, ভাবি সরাচ্ছো জঞ্জাল এ-দেশের।'
মৃত্যু তার, বলে ওরা, করেছে আমাকে মহীয়সী,
আরো কত কথা বলা হয়
যা' শুনে আমার মাথা গর্বে দূরের আকাশ ছুঁতে
পারে লহমায়।
নিজস্ব দুঃখের চেয়ে গৌরব অনেক বড়, এই
অলঙ্কৃত ভান নিয়ে দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া
কী দুঃসহ, আমি ছাড়া বুঝবে কে আর পৃথিবীতে?
আমার এ-শূন্য বুক পোড়ো বাড়ি, যাতে
লক্ষ্মীপেঁচা ডেকে ওঠে ঘোর মধ্যরাতে, ক্লান্ত লাগে,
দেয় না ঘুমোতে কিছুতেই ফণীমনসার খোঁচা।

যে তন্বীকে ভাবতো সে স্বপ্নের একান্ত সহচরী,
তার দুটি হাতে মেহেদীর ছোপ লাগার আগেই
একটি শিকারী বাজ ওকে
করেছে হনন,

কেননা সে চেয়েছিলো গণতন্ত্র মুক্তি পাক লিখে
বুকে, স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘোষণা করে
হেঁটে যাবে রাজপথে, মাথা তার ছোঁবে
আকাশের মেঘলা খিলান। এখন সে জীবনের সাজ-পরা
কিংবদন্তি; কিন্তু আমি কী করবো এই
কিংবদন্তি নিয়ে? স্বপ্নে-দেখা কী নির্দয়
গোলাপ ফুটেছে দ্যাখো, দ্যাখো দেশবাসী
তরতাজা যৌবনের বুকে!

হয়তো ভবিষ্যতে অনেকেই
তার কথা বলে দিব্যি মাতাবে শ্রোতার ভিড় আর
করবে এমন কেউ কেউ উচ্চারণ
ওর নাম, হোমরা-চোমরা তারা, যারা
তার কথা বলছে শুনলে সে আবার অকস্মাৎ
জিন্দা হয়ে পতাকার মতো হাত তুলে
জনসভা পণ্ড করে জানাবে তুমুল প্রতিবাদ,
ওদের মুখোশ-আটা ভণ্ড মুখে দেবে ছুড়ে থুথু, শুধু থুথু।

প্রকাশকাল : ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭, *সাপ্তাহিক দেশবন্ধু*

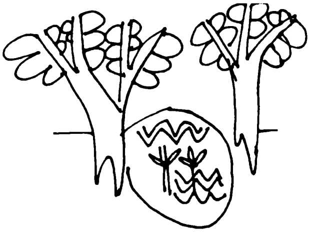

২০১৬

১০ নভেম্বরে শহীদের পিতার জিজ্ঞাসা

মতিউর রহমান

সাতাশির ১০ নভেম্বর থেকে আটাশির ১০ নভেম্বর—এক বছর পূর্ণ হলো। গত বছর এই দিনে, বনগ্রামের সাহসী যুবক নূর হোসেন উদোম গায়ে বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' আর 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছিলেন। তারপর পুলিশের লক্ষ্যভেদী গুলিতে বনপাখির মতো লুটিয়ে পড়েছিলেন রাজপথে।

শহীদ হলেন নূর হোসেন। গণ-আন্দোলনের এক উজ্জ্বল পতাকা হয়ে গেলেন। কিন্তু নূর হোসেনের লাশ কোথায় কবর দেওয়া হলো, তার কোনো নির্দিষ্ট খবর কোথাও প্রকাশিত হলো না। পরিষ্কার কিছু জানা গেল না। কোনো কোনো পত্রিকায় খবর বের হয়েছিল, জুরাইনের গোরস্থানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে। এ খবর শুনে নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমান ১৩ নভেম্বর দৌড়ে গিয়েছিলেন সে জায়গায়। জুরাইনের কবরখোদকেরা তাঁকে জানান, ১২ নভেম্বর শেষ রাতে, তখন বাজে তিনটা; আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের গাড়িতে করে তিনটি লাশ আনা হয়। পুলিশ ছিল সঙ্গে।

কবরখোদকদের কথায়, তাঁদের একজন ছিলেন প্যান্ট পরা, হাতে ঘড়ি। একজন লুঙ্গিতে। আরেকজনের মুখে দাড়ি। পায়ে কেডস জুতা। উদোম গতর। বুকে-পিঠে কী যেন লেখা ছিল।

মজিবুর রহমান বলেন, 'তিনজনের শেষ জনই হবে আমার নূর হোসেন। আমি কবর খুঁড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি।'

তিনি আরও বললেন, 'সাত দিন পর আবার গিয়েছিলাম এক বন্ধুকে নিয়ে। আবার কবর খুঁড়তে চেয়েছিলাম। কোনটি আমার ছেলে, আমার নূর হোসেনের কবর, সেটা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কবর খুঁড়তে দেয়নি আমাকে।'

এক মাস পর, পরিবারের সবাইকে নিয়ে মজিবুর রহমান আবার গিয়েছিলেন জুরাইনের গোরস্থানে। সেদিন সবাই কান্নাকাটি করেছিলেন অনেক। আবারও কবর খোঁড়ার প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল। কিন্তু মজিবুর রহমানই সেদিন সবাইকে বুঝিয়েছেন, এখন তো আর চেনার কোনো উপায় নেই। কবর খুঁড়ে কী হবে? তাই সবাই মিলিতভাবে দোয়া পড়ে চলে আসেন।

এখন এক বছর পর নূর হোসেনের পিতার করুণ প্রশ্ন, 'সত্যি কি নূর হোসেনের কবরের খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন ছিল? আপনারা চেষ্টা করলে কি এটা সম্ভব ছিল না? আপনারা কেন এ চেষ্টা নিলেন না? তাহলে তো আমি অন্তত জানতে পারতাম, আমার ছেলে আমার মানিক কোথায় ঘুমায়ে আছে? আপনারা কেন কিছু করলেন না?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার কাছে ছিল না। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে ছিলাম তাঁর সামনে। সত্যি, সে চেষ্টা কেন আমরা করলাম না? শুধু নূর হোসেন কেন, বছরের পর বছর কতজন শহীদ হয়েছেন, তাঁদের কবর কোথায়? এসবের কতটুকু আমরা জানি? শহীদ পরিবারগুলোর তেমন কোনো খবরও রাখি না আমরা।

প্রতিবছর কোনো নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো দিবস পালিত হয়। এ দিবসগুলোও আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়। এগুলোর প্রয়োজনীয়তাও বুঝি ফুরিয়ে যায় এক সময়ে, যেন ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মৃত ব্যক্তি ও শহীদকে নিয়ে দলাদলি আর প্রচারও কম হয় না। তিনি কার এবং কোন দলের ছিলেন, তা নিয়ে কোনো কোনো সময় নোংরামিও হয়। এসব আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা আর দীনতারই আরেক নগ্ন রূপ।

সাতাশির ১০ নভেম্বরে আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠলেন নূর হোসেন। দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রে তাঁর ছবি ছাপা হলো। সারা দুনিয়ার সংবাদ হলেন নূর হোসেন। তাঁকে নিয়ে কবিতাও লেখা হলো অনেক। নাটক হলো। পোস্টারের বিষয় হয়ে উঠলেন নূর হোসেন। এই আশির দশকের জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে নূর হোসেন এক গর্ব, নতুন এক সাহস।

১০ নভেম্বর নূর হোসেনের আত্মদানের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবারও সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠল। দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকায় তাদের নিয়ে অসংখ্য খবর বের হলো। নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমানের অনেক সাক্ষাৎকার বের হলো। ছোট-বড় নানা রকম সভা-সমাবেশ, আলোচনায়, এমনকি শহীদ মিনারে বুদ্ধিজীবীদের মস্ত বড় অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি করা হলো। প্রচুর সম্মান দেওয়া হলো তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে। মজিবুর রহমান যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি গর্বিত হৃদয়ে পুত্রশোকের সান্ত্বনা খুঁজলেন।

সে সময় জাতীয় রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতা এবং তাঁদের সহযোগীরা মজিবুর রহমানের বনগ্রামের এক ঘরের গেরস্থালিতে গিয়েছিলেন। শুধু যাননি জাতীয় পার্টি আর জামায়াতে ইসলামীর কেউ। সে ঘরে নেতাদের বসতে দেওয়ার মতো জায়গা ছিল না। এমন সব ব্যক্তির আগমনে শহীদের পিতামাতা উচ্ছ্বাসে তাঁদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা কিছু চাই না। আমাদের ছেলেকে আর কোনো দিন ফিরে পাব না। "গনতন্ত্র মুক্তি পাক" আমাদের ছেলের এ স্লোগান যদি পূরণ হয়, তাহলেই আমরা খুশি। আপনাদের কাছ থেকে সে আশ্বাসই পেতে চাই। আপনারা সবাই মিলে "স্বৈরাচার নীপাত যাক" আন্দোলন করেন। তাহলেই আমরা সুখী।'

শহীদ নূর হোসেনের বৃদ্ধ পিতামাতা এবং পরিবারের সবাইকে আমরা আশ্বাস দিলাম, তাঁদের দুই হাতে হাত রেখে সাহস দিলাম

আর বললাম, আমরা আছি। আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আমরা স্বৈরাচারের পতন ঘটাব, গণতন্ত্রকে মুক্ত করব। আমাদের সেই আশ্বাস, সেই সাহসে শহীদ পরিবারের সবাই আশ্বস্ত হলেন। চোখের পানি মুছে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সবার জন্য দোয়া করলেন। জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তাঁদের কর্মী আর সমর্থক আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। মাসের পর মাস সভায়, বক্তৃতায়, প্রস্তাবে আর মিছিলের স্লোগানে দৃপ্তকণ্ঠ শপথ উচ্চারিত হলো, শহীদ নূর হোসেনের বুকে-পিঠে লেখা স্লোগানকে আমরা বাস্তবায়িত করব।

তারপর এক বছর কেটে গেল। আবার ১০ নভেম্বর ফিরে এসেছে। দিনটি পালনের মাধ্যমে শহীদ নূর হোসেনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভা-সমাবেশের প্রস্তুতি চলছে। এগুলো থেকে উচ্চ কণ্ঠ স্লোগান, শোকাহত ব্যানার, উত্তেজিত বক্তৃতা আর সুলিখিত প্রস্তাবে আবার প্রতিজ্ঞা, সংকল্প ও শপথের কথা ঘোষিত হবে। সেগুলো পত্রিকার পাতায় নানা রকম শিরোনাম পাবে। সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে 'আমরা নূর হোসেনের ভাই' এ কথা ভাবতে ভাবতে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাব।

কিন্তু সমস্ত উচ্ছ্বাসকে পাশে সরিয়ে যদি বাস্তবতায় ফিরে আসি, যখন গত এক বছরের ঘটনাবলিকে স্মরণ করি তখন দেখি, স্বাধীন বাংলাদেশের দীর্ঘতম (প্রায় ছয় মাস) আন্দোলন সত্ত্বেও 'এক দফা' দাবি অর্জিত হলো না; অন্য কোনো দাবিও নয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অনেক বিজয় হয়েছে বলা হলেও মানুষ তা বোঝেনি, দেখেনি। বরং সরকার একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলো কার্যকর করে চলেছে।

এসব নিয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবেন মজিবুর রহমান। এই এক বছর সময়-অসময়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনিও এসেছেন। তিনি ভাবেন, শুধু তাঁর নূর হোসেন নয়, বহু কর্মী শহীদ হলেন গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে গিয়ে। কিন্তু যে লক্ষ্যে তাঁদের মৃত্যু হলো, সেটা শুনছি সব সময়ে, কিন্তু সে কাজের অগ্রগতি কত দূর হলো?

মজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা গরিব, আমাদের অনেক সমস্যা আছে। গরিবের সমস্যা নিয়ে আমার ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১০ নভেম্বরের আন্দোলনে।' তিনি এখনো মনে করেন, যদি মনোবল আর বিশ্বাস ঠিক থাকে, সবাই যদি তাকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে দাবি আদায় হতে পারে। সে জন্য সব দলের কাছে তাঁর আকুল আবেদন, একজন শহীদের পিতা হিসেবে তাঁর একান্ত চাওয়া, সবাই যেন তাঁর ছেলের মতো গরিবের সমস্যা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে না? মজিবুর রহমান বুঝতে পারেন না, কেন আন্দোলন হচ্ছে না? গত ১০ নভেম্বরের মতো এবার তেমন উদ্যোগ কেন নেই নেতৃত্বের? রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না? যাঁর সন্তান গেছে, যাঁর ভাই গেছে, শুধু তাঁরাই বুঝতে পারেন তাঁদের শোক আর বেদনাকে?

গত এক বছর শহীদ নূর হোসেনের পিতা হিসেবে মজিবুর রহমান অনেক সম্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সে জন্য তিনি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, 'আমি গরিব। গরিব হিসেবেই আমি থাকতে চাই। অর্থ বা কোনো সম্পত্তির জন্য আমার কোনো লোভ নেই।'

কোনোভাবে সরকারের সুবিধা হয় এমন বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য গত এক বছরে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে। একাধিকবার এ রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সরকারের কোনো কোনো মহলের পক্ষ থেকে। মজিবুর রহমান বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্য সবাইকে যা বলেন, তাঁদেরও তিনি একই কথা বলেছেন। কারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি মজিবুর রহমানের। তাঁর কাছ থেকে বিবৃতি নিয়ে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে নষ্ট করতে চেয়েছেন তাঁরা এবং তাঁকে হেয় করতে চেয়েছেন। কী বিরল চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আদর্শবাদী মানুষ বেবিট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমান!

অথচ তাঁকে যে সুবিধা প্রদানের লোভ দেখানো হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক কম দামে, বাজারের মাছের মতো বিক্রি হয়ে গেছেন

কত বড় বড় রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী। আরও অনেকে হয়তো যাবেন লোভের পিচ্ছিল সেই পথে।

গত এক বছরে মজিবুর রহমান আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এখন সপ্তাহের সাত দিন বেবিট্যাক্সি চালাতে পারেন না। শুধু চার দিন গাড়ি নিয়ে বের হন। তাঁর চোখের শক্তি কমে আসছে। বাতের ব্যথা বেড়েছে। বিশেষ করে শরীরের ডান দিকে মাঝেমধ্যে হঠাৎ ঝাঁকুনি আসে। তবুও গাড়ি চালাতে হয়। অন্যের গাড়ি। জমা, তেল খরচসহ অন্যান্য খরচের পর কতটুকু আর থাকে। বড় ছেলে আলী হোসেন মিনি ট্রাক চালাতেন। তাঁর চাকরি এখন নেই। সেজ ছেলে দেলোয়ারও বেকার। ছোট ছেলে আনোয়ার কাজ শিখছেন। মেয়ে সাহানা অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

গত বন্যার সময় বৃষ্টিতে মজিবুর রহমানের ঘরটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বহু কষ্টে তা মেরামত করা সম্ভব হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে সাহায্য করেছে। সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

বয়স বেড়ে যাচ্ছে মজিবুর রহমানের। কিন্তু সংসার পরিচালনার স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা হলো না। নূর হোসেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচবেন, এটা তাঁর স্বপ্ন ছিল। তিনি নেই। এখন সেই স্বপ্নও আর নেই। মজিবুর রহমান জানেন না সামনে তাঁর কী আছে।

মজিবুর রহমান ভাবেন নূর হোসেনের কথা। ভাবেন সামনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। এসব ভাবনা থেকেই তিনি বলেন, 'নূর হোসেনের মৃত্যুর পর সবাই আমাকে শ্রদ্ধা জানাল। ভাবতে শুরু করলাম, আমিও একটা "ইডবিডি পাখি" (যে পাখি স্বর্গে যেতে চায়, কিন্তু পারে না) হয়ে গেলাম। আমিও সবার সঙ্গে উড়তে পারব। আমিও ওপরে উঠতে পারব। সেটা আমার ভুল। "ইডবিডি পাখি" কোনো দিন স্বর্গে উড়ে যেতে পারে না। আপনারা আমাকে স্বর্গে উঠিয়েছিলেন। তারপর এখন আমি কোথায়? কোথায় আমার স্থান?'

মজিবুর রহমানের সঙ্গে বিগত এক বছরে বহুবার দেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে শুরু করে বড় বড় জাতীয়

বিষয়াদি—সবকিছু নিয়ে কথা হয়েছে। অধিকাংশ সময় তিনি বলেছেন আমি শুনেছি। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তাঁর জীবনসংগ্রাম থেকে শেখারও থাকে অনেক। প্রায়ই তিনি আসেন। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আসেন। অল্প সময় থেকেই তিনি চলে যান। এ রকমই এসেছিলেন গত ৩ নভেম্বরে।

এসেই বললেন, 'একটা কথা মনে হলো, সেটা বলতে এলাম।' তিনি যা বললেন, সেটা একটা গভীর উপলব্ধির কথা।

মজিবুর রহমান বলেন, 'যদি সাহস, সংগঠন আর উপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকে, যদি প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে মানুষকে ডাক দিয়ে, পথে নামিয়ে, গুলির সামনে ঠেলে দেওয়ার কী দরকার? যদি আন্দোলন সফল না হয়, তাহলে কে দায়ী? জনগণ? কেন এমন হয়?'

সেদিন মজিবুর রহমানের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারিনি। কোনো জবাব কি ছিল না? জবাব থাকলেও দিইনি। কারণ, আমরা আমাদের কথাগুলোকে, ভেতরের সমস্যা বা দ্বন্দ্বগুলোকে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করি বেশি। আমাদের সমস্যার কথা মানুষকে জানাই না। যেন তাদের কোনো কিছু জানার থাকতে পারে না। তাদের কাজ হলো শুধু নির্দেশ মেনে চলা। আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং ডাক দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়া আর শহীদ হয়ে যাওয়া।

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, সে অবস্থাটা আর থাকছে না। মজিবুর রহমানের মতো মানুষেরা এখন সবটা বুঝে নিতে চান। তাঁদের মঙ্গল-অমঙ্গল জেনে-বুঝে এগোতে চান এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর এদিকটার প্রতি আমাদের নজর এখনো খুব কম। তার পরও মজিবুর রহমান আশাবাদী মানুষ। সব সময়ই তিনি বলেন, 'দেশ যেদিন স্বৈরাচার থেকে মুক্ত হবে, গণতন্ত্র ফিরে আসবে, সেদিনই আমি সত্যিকার অর্থে আনন্দিত হব।' সেটাই হবে তাঁর জন্য ফুলের মালা। সেদিনের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সেই দিন কবে আসবে?

প্রকাশকাল : ১১ নভেম্বর ১৯৮৮, *দৈনিক সংবাদ*

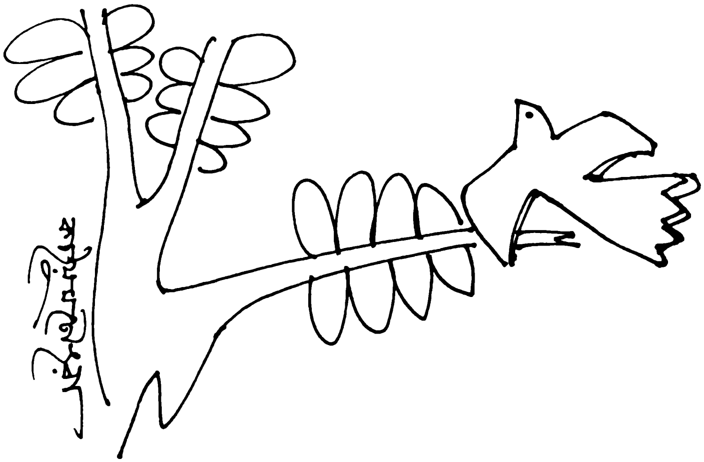

আলো-ঝরানো ডানা

শামসুর রাহমান

রোজকার মতো আজো আমার ঘুম ভাঙলো
ভোরবেলা। হাওয়ার সঙ্গে নারকেল গাছের পাতার খেলা
দেখলাম দুচোখ ভরে। একটা পাখি
এসে নাচানাচি শুরু করলো ডালে, শিস্‌ও দিলো
দু-একবার। এই মুহূর্তে মনে হলো, কোনো শোক নেই
পৃথিবীতে; কোনো হতাশা অথবা
বিক্ষোভের কারণের কথাও মনে করতে পারলাম না। চারদিকের
শোভা আমাকে রাখলো আচ্ছন্ন করে।

এই মুহূর্তে স্তোত্র রচনা করতে পারি গাছের পাতায়
মিশে-যাওয়া রোদের, পাখির শিসের বিষয়ে। বাথরুমে
ট্যাপ থেকে টপটপানো পানি, আলনায় ঝোলানো
উপহার-পাওয়া পাঞ্জাবি, ফ্যানের হাওয়ায় ওড়া
পেঙ্গুইনের আধ-পড়া পেপার ব্যাকের স্তুতি গাইতে পারি।

আমার পক্ষে অসম্ভব নয় হৃদয়জোড়া
ভালোবাসার জয়, সামনের দিকে প্রসারিত

নির্জন পথ কিংবা সেই মন-কেমন-করা ঘর, যেখানে
আমার প্রিয়তমা বসত করে, গুন গুন করে গান গায়,
যেখানে ঝরে যায়
অনেক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার মুকুল, রুক্ষ জমিনে
ফুটে-ওঠা স্মিত ফুল, তার কপালে লুটিয়ে-পড়া চুল, ওর
দ্বিধা-জড়ানো খানিক দাঁড়িয়ে থাক। সিঁড়ির ধাপে
আমার মায়ের মুখের সোনালি বিহ্বলতার
স্তব রচনা করা।

আমার যে-মেয়ে বিদেশে গোছাচ্ছে সংসার, যাকে
দীর্ঘকাল দেখিনে, কিংবা সেই ছেলে, যাকে মৃত্যু ছিনিয়ে
নিয়ে গেছে আমার বুকের
পাঁজর খসিয়ে তাদের নিয়ে বিধুর কিছু লেখার
বেদনা আমি সইতে পারি সহজেই। দুজনের
মধ্যে যে চিরকালীন দূরত্ব বিদ্যমান, তাকে সরিয়ে
ফেলার ব্যর্থতা অন্ধকারে আবৃত বৃষ্টির দিন যে তোলপাড়
সৃষ্টি করে মনের গহনে, যে বুলবুলি কোনোদিন
এসে বসবে না আমার ঘরের ঘুলঘুলিতে,
এসব কথাও মঞ্জরিত হতে পারে আমার খাতার পাতায়।
কিন্তু আজ ভোরবেলা আমি নিজেকে সরিয়ে
নিচ্ছি এসব থেকে। আজ বৃক্ষ, পাথর আর
নক্ষত্রের স্তবগান গাইবো না। আমি উচ্চারণ করবো
সেই মানুষটির নাম, যাকে আমি
কোনোদিন দেখিনি অথচ মনে হয় দীর্ঘকাল সে
জড়িয়ে আছে আমার দিন যাপনে,
আমার নিভৃত স্বপ্নে, যে আমার সঙ্গে কথা বলে বার বার
অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বরে। তার ঠোঁটের নড়া, হাসি
এবং চোখের আগুন আমার মুখস্থ,
অথচ তাকে কোনোদিন চোখেও দেখিনি।

এইতো আমি দেখছি পুরাকালের বীরের ভঙ্গিতে
কোন্ দুর্বার ইঙ্গিতে সে কোনো ভোজসভায় নয়,
হেঁটে যচ্ছে ধুন্দুমার যুদ্ধক্ষেত্রে, স্পষ্ট দেখছি সে
ছুটে চলেছে উদোম গায়ে। মেঘের গর্জনের মতো
সাহস আর অন্তহীন দেশপ্রেম ছাড়া
তার কোনো অস্ত্র নেই। সে ছুটে চলেছে শত্রুদের
নির্মম ব্যূহের ভেতরে। তার যাত্রা ছিলো
ফিরে না আসার মহিমা-খচিত।
ওর মা কাতর কণ্ঠে মিনতি জানিয়েছিলেন,
'নূর নূর, বাছা আমার, আয় ফিরে আয়।'
কিন্তু সে ফিরে আসেনি। ফিরে আসার জন্যে
অমন করে কেউ কোথাও যায় না
বুনো বরাহের দঙ্গলে।
ওর বর্ষীয়ান পিতা, যিনি বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে
পা রেখেছিলেন ঢাকার মাটিতে,
তিনি 'নূর নূর' বলে ডাকেন, কিন্তু এক থমথমে নিস্তব্ধতা ছাড়া
তিনি কোনো সাড়া পান না। তিনি এই পাথুরে
শহরের উপেক্ষিত
দরিদ্রমণ্ডলীর একজন, অথচ তাঁর মাথায়
জ্বলজ্বলে সোনার মুকুট, যা পরিয়ে দিয়েছে
তাঁর হৃদয়ের নূর। সেই মুকুটের দিকে তাকানোর
সময় কোথায় এই নষ্ট শহরের?

দু'দুটো বর্ষা বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশকে ধুইয়ে,
কিন্তু আমি সত্যি দেখতে পাচ্ছি, নেকড়ের দাঁতের মতো
বুলেটে ঝাঁঝরা ঐ যুবার বুকের রক্ত প্রবল
বর্ষার অবিরল জলও রাজপথ আজো
মুছে ফেলতে পারেনি। প্রবালের মতো জ্বলছে চাপ চাপ
রক্ত আর দেখছি ওর দুই কাঁধে।

গজিয়ে উঠেছে আলো-ঝরানো ডানা। আমাদের
চোখ কখনো কখনো ঝলসে ওঠে সেই আলোয়।
না, তাকে ওরা হত্যা করতে পারেনি। তা হলে
কে অমন আলো-ঝরানো এক জোড়া
ডানা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে মেঘে মেঘে, হেঁটে চলেছে
রাজপথে? ওর চোখে নক্ষত্রের নীড়, বাহুতে
অনির্বাণ বরাভয়। নূর, নূর, নূর হোসেন বলে
ডাকছে রাজপথ, নদীনালা, গাছপালা, নীলকণ্ঠ
বাংলাদেশ। কখন আবার দশমিক
ওলট পালট করে জেগে উঠবে নতুন যৌবন?

প্রকাশকাল : ১১ নভেম্বর ১৯৮৯, *সাপ্তাহিক একতা*

শহীদ নূর হোসেনের পিতার আশাবাদ

মতিউর রহমান

সাতাশির ১০ নভেম্বরকে স্মরণ করে অনেক বিবৃতি আর বক্তৃতা হয়ে গেল। স্মৃতিচারণা করা হলো সেদিনের ঘটনাবলি নিয়ে। অনেক শপথবাণী উচ্চারিত হলো শহীদ নূর হোসেনের নাম করে। তবুও কেন জানি দর্শক আর শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনো অনুরণন সৃষ্টি হলো না। আশার বীজ রোপিত হলো না মানুষের মনে। ঠিক এ রকমই হয়েছিল আটাশির ১০ নভেম্বরেও। সেই বিবৃতি, সেই সভা, সেই উচ্চ কণ্ঠে ভবিষ্যৎ-ঘোষণা; বলা যায়, সবই হুবহু মিলে গেল। ঠিক এমনটাই যে হবে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি কারও।

সাতাশি সালের নভেম্বরে সরকারবিরোধী যে ঐক্যবদ্ধ তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার চেয়ে আরও শক্তিশালী জমায়েত-মিছিলের অভিঘাত দূরের কথা, নতুন করে আন্দোলন পুনর্গঠিত করাও সম্ভব হয়নি বিগত দুই বছরে। সে আন্দোলনে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে যে ঐক্য, সমঝোতা ও যুগপৎ সংগ্রামের প্রক্রিয়া ছিল, তা ভেঙে গিয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যেই। সেটা পরে আর পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সে সম্ভাবনাও এখন আর দেখা যায় না। কোনো জোট বা দলের পক্ষ থেকেও এককভাবে জাতিকে আলোড়িত করার মতো কোনো

আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সরকারের পতন আসন্ন—এমন ঘোষণায়, প্রস্তাবনায় মানুষের মধ্যে তেমন কোনো উদ্দীপনা আর সৃষ্টি হয় না।

কেন এমন হলো? কেন এমন হয়? এ প্রশ্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের শুধু নয়, সাধারণ মানুষেরও একই জিজ্ঞাসা। শুধু তা-ই নয়, বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে সমাজে, রাজনীতিতে। হতাশা আর আস্থাহীনতা জায়গা করে নিচ্ছে মানুষের মনে, সংগঠনে। এই লাখো-কোটি সাধারণ মানুষের একজন, শহীদ নূর হোসেনের পিতা, বৃদ্ধ মজিবুর রহমানেরও একই প্রশ্ন। জীবনসংগ্রামের বহু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গভীর উৎকণ্ঠার সুর কণ্ঠে নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের পুঁজি আমাদের শক্তি শেষ হয়ে গেলে আমরা কীভাবে চলব? সবাই মিলে এক হয়ে দাঁড়ালে, ঝাঁপিয়ে পড়লে, খুব বেশি কিছু লাগে না। কিন্তু কেন সবাই মিলে, একত্র হয়ে দাঁড়াতে পারি না?'

এই একটি সহজ, কিন্তু মস্ত বড় প্রশ্ন সবার। কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার চিন্তাভাবনা শহীদ নূর হোসেনের পিতার। শহীদের পিতা বলেন, 'আন্দোলন ব্যাপারটা একটা বিশ্বাস, একটা মনোবল। প্যালেস্টাইনবাসী স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েও মনোবল হারায়নি। তারা বলে, আবার জেরুজালেমে যাব। নিশ্চয়ই তারা একদিন তা পারবে। তারা জেরুজালেমে যাবে। আমাদের সে মনোবল কোথায়? আর তা না হলে সরকারকে আমরা হটাব কী করে?'

মজিবুর রহমান বিগত দুই বছরে আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। বুকভরা শোক, বিষণ্ন মন আর অসুস্থ দেহ নিয়ে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে ঢাকার রাস্তায় বেবিট্যাক্সি চালান তিনি। বেবিট্যাক্সির মালিককে এখন দৈনিক জমা দিতে হয় ১৫০ টাকা। সারা দিনের তেল, স্ট্যান্ড পার্কিং ও খাওয়া বাবদ খরচ আরও ২০০ টাকা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটুনির পর আজকাল ঘরে ফেরেন ৬০ থেকে ৭০ টাকা নিয়ে। কোনো কোনো দিন খুব বেশি হলে ১০০ টাকা আয়

হয়। যাত্রীদের আজকাল আর 'যাব না' বলার সুযোগ নেই। তাদের কাছ থেকে অনুনয়-বিনয় করে টাকা নিতে হয়, বাজারের অবস্থা বোঝাতে হয়। মানুষের হাতেও পয়সা নেই। তাই অনুরোধ করতে হয়।

এখন সপ্তাহের সব দিন বেবিট্যাক্সি চালাতে পারেন না মজিবুর রহমান। বসে থাকার দিনগুলোয় চলতে হয় কষ্ট করে, কোনো রকমে টেনেটুনে। বড় ছেলে আলী হোসেন বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর এখন আবার কাজ করছেন। ছোট দুজন আবার বেকার। মাঝে কিছুদিন তাঁদের কাজ ছিল। একমাত্র মেয়ে সাহানা পড়ে নবম শ্রেণীতে। নূর হোসেনের মা শোকে রোগে শুকিয়ে সারা এখন।

শহীদ নূর হোসেনের পিতার পরিবার এখনো থাকে বনগ্রামের আস্তানায়, ছেলেমেয়েসহ ছয়জন। তাঁদের এক ঘরের গেরস্থালিতে প্রায়ই কথাবার্তা হয়—ছেলেটা এই ঘরে ছিলেন, এখান থেকেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি, বড় হতে চেয়েছিলেন। মা-বাবাকে নিয়ে ভালোভাবে থাকার স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখের কোণে, মনের গভীরে। এখনো মা যখনই ভাত বাড়তে যান কারও জন্য, তখনই তাঁর মনে পড়ে নূর হোসেনের সেই প্রাণজুড়ানো ডাক, 'মা ভাত দাও।' তখন শহীদের মায়ের বুক হু হু করে ওঠে, সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে তাঁর মুখ, নূর হোসেনের সমগ্র আদল, উদোম শরীর। তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না।

এভাবেই চাপা দীর্ঘশ্বাস, অব্যক্ত কান্না আর বুকভরা শোক নিয়ে নূর হোসেনের পরিবারের দিন, সপ্তাহ, মাস আর বছর চলে যায়, আবার বছর ঘুরে আসে। তাঁরা আরেকটি ১০ নভেম্বরের অপেক্ষায় থাকেন। ভাবেন, আবার আন্দোলনের ঝড় উঠবে। তাঁদের প্রিয় সন্তানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, স্বৈরাচার নিপাত যাবে, গণতন্ত্র মুক্তি পাবে। তাঁরা সভায় শরিক হন, মিছিলে স্লোগান তোলেন কিন্তু সে রকম আন্দোলন আর হয় না। কেন হয় না, কেন হবে না? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে, জানতে মজিবুর রহমান হরতালের বন্ধ দিনে কোনো

কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের কাছে যান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে, বুঝতে চান সবকিছু। কিন্তু সব কথার পরও তিনি কোনো সদুত্তর পান না, তাঁর মনে শান্তি আসে না। কোথায় একটা ফাঁক থেকে যায়।

মজিবুর রহমান এখন আর পরিবারের জন্য তেমন চিন্তা করেন না। তাঁর ছেলে নূর হোসেন 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' দাবিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সে জন্য দেশের মানুষ তাঁকে বহু সম্মান দিয়েছে। অনেক ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ শুধু ভাবেন, কীভাবে নূর হোসেনের স্বপ্ন পূরণ হবে, কী করলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে? শহীদের পিতা, একজন বৃদ্ধ মানুষ, তবুও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'তার আদর্শ, তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমি যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় সে আয়োজন, কোথায় সে পরিকল্পনা?'

তিনি আরও বলেন, 'আমি শহীদের পিতা, আমার কোনো শত্রু থাকতে পারে না, আমি সবাইকে অনুরোধ করি, আসুন, আমরা একত্রে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করি। কিন্তু সে জন্য মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংকট কাটানোর জন্য ভালোবাসা দরকার। অন্তরে ভালোবাসা থাকলেই সেটা সম্ভব। পেছনে যা গেছে, যা হয়েছে, তা দূরে চলে যাক। এখনো সময় আছে, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে দাবি আদায় সম্ভব।' তিনি বলেন, 'তার পরও কেন কিছু হচ্ছে না? কারা দায়ী? আমরা জনগণ? না, নেতারা? নেতৃত্ব চাইলে, নেতৃত্ব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে মানুষ আবার জেগে উঠবে। আবার লড়াই হবে।'

এই সত্য ভাবনা আর কথাগুলো সবাই জানেন, সবাই বোঝেন। কিন্তু সে পথ গ্রহণে কত দ্বিধা, কত দ্বন্দ্ব! এ কথা অনস্বীকার্য যে ঐক্য করতে, আন্দোলন করতে সমস্যা কম নয়। আর প্রস্তুতিহীন বা আরোপিত আন্দোলনের ফল যে ভালো হয় না, সে অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে অনেক। তবুও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, যতটুকু করা যায়, যা করা সম্ভব, সেটুকুও করা হচ্ছে না। অনেক সময়ই

যেন সবার প্রয়োজনের কাজের চেয়ে দল বা গোষ্ঠীর চিন্তাই প্রধান হয়ে সামনে চলে আসে। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

এভাবেই দেখা যায়, আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা, অনেক কর্মসূচি হলেও ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম বর্তমানে অনেকটা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সরকারের সামনে এখন তেমন কোনো চ্যালেঞ্জ দেখা যায় না; আর এ সুযোগেই নানাভাবে সরকার তার ভিত্তি বা প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সবকিছু করছে। তবুও সরকারের বৈধতা আসছে না, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে না। দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক সমস্যাবলি বেড়ে চলেছে।

মজিবুর রহমান আরও বলেন, 'সারা দিন বেবিট্যাক্সি চালাই, কত মানুষের সাথে দেখা হয়, কোনো শান্তি নেই কারও জীবনে। সবাই ছুটে চলেছে, প্রাণপণ ছুটে চলেছে। আমি দেখি, মানুষ বাঁচতে চায়, মানুষ সুখ চায়। সেই সুখ, সেই মুক্তি তারা কবে পাবে? আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, স্বাধীন হয়েছিলাম। শুধু পতাকা বদল নয়, সত্যিকার অর্থে দেশ গড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু কী পেলাম?'

বাংলাদেশের গ্রাম-শহরের লাখো-কোটি মানুষের মনে এ রকম বহু প্রশ্ন, বহু দাবি। স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক নতুন সরকারের বহু আশ্বাসবাণী শুনতে শুনতে তারা এখন সহজে আর আন্দোলিত, উৎসাহিত হয় না, মন টানে না। কারণ, তারা দেখছে তাদের জীবনের, তাদের সংসারের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বাড়ছে, কমছে না। এসব কিছুই আল্লাহর অমোঘ নিয়ম ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও ঢাকার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনযুদ্ধে পোড়খাওয়া যোদ্ধা, বহু লড়াই-সংগ্রামে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ মজিবুর রহমান আশাবাদী।

তিনি বলেন, 'আমার ছেলে রক্ত দিয়েছে, তা বৃথা যেতে পারে না। আমার যা সম্মান, সৌভাগ্য, সেটা তার জন্যই। আমি না থাকতে পারি, কিন্তু ইতিহাস দেখবে, একদিন বিজয় হবে। নূর হোসেন বলেছিল, সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে। সারা

পৃথিবী তার কথা জেনেছে। সে জাতির বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছে। দুই বছর শুধু নয়, এক দশক ধরে সভা-সমাবেশ অনেক হলো। হরতালও কম হলো না। কিন্তু কিছুই হলো না। সরকারের জায়গায় সরকার রয়েছে। নিজেদের পছন্দমতো নীতি নিয়ে চলেছে একের পর এক। কোনো কিছুই প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।'

শহীদ নূর হোসেনের পিতা প্রশ্ন করেন, এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে? চারদিকে বেড়া দিয়ে আটকানো গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে। সে জন্য কৌশল বদল করতে হবে। সবাই বলে, জনগণই সব শক্তির মূল। তাহলে তাদের নিয়ে চলতে পারি না কেন? যত হরতালই হোক না কেন, কিছুই হবে না তাতে। কিন্তু হতেই হবে, আজ না হোক কাল, না হয় পরশু। এক বছর, না হয় দুই বছর, তার পরও গণতন্ত্রকে আসতেই হবে। এখন সবাই না বুঝলে, পরে হলেও বুঝতে হবে। তাই মজিবুর রহমান আবারও বলেন, 'আন্দোলন একটা বিশ্বাস, একটা মনোবল। সে বিশ্বাস সে মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে। সে জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

প্রকাশকাল : ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯, *দৈনিক সংবাদ*

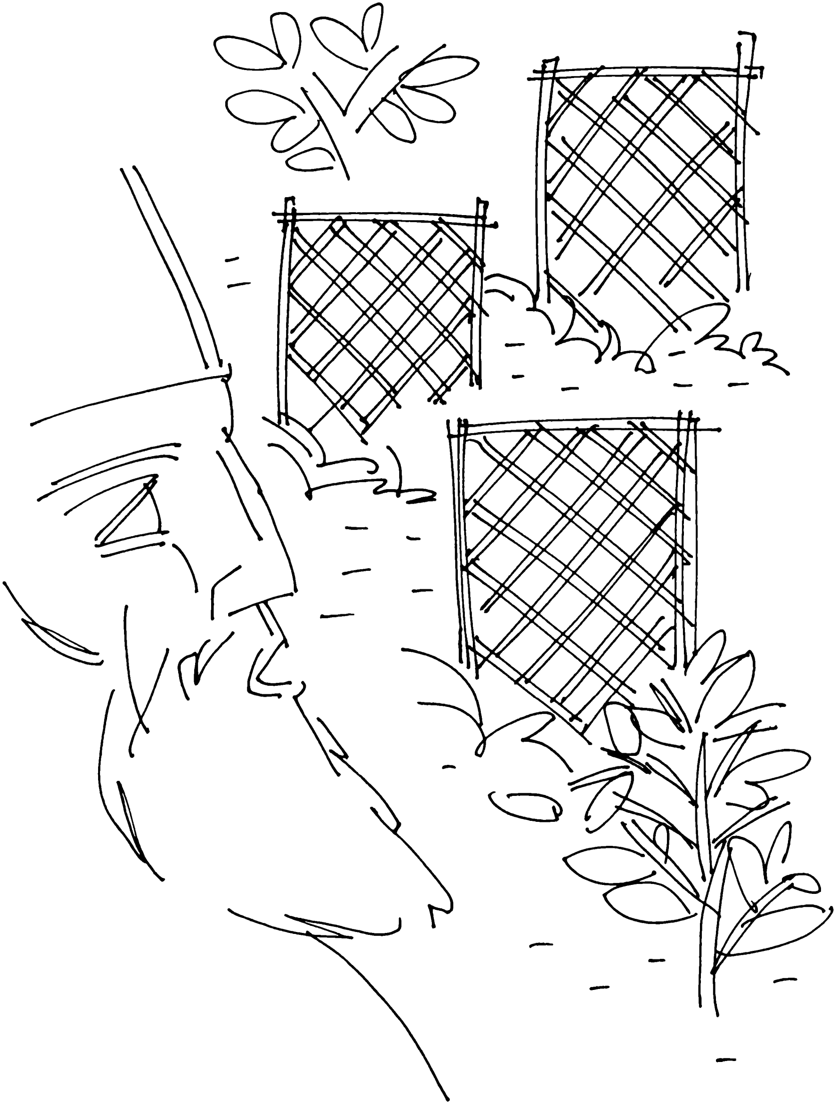

২০১৬

‘তার বুকে-পিঠে লেখা ছিল, সেগুলো ঘইষ্যা তুলতে পারি নাই’

মতিউর রহমান

‘তার বুকে-পিঠে লেখা ছিল, সেগুলো ঘইষ্যা তুলতে পারি নাই। পুলিশ-বিডিআর খুব তাড়াহুড়া করছিল। তাড়াতাড়ি কবর দিতে কইছিল।’ বলছিলেন আলমগীর।

জুরাইন গোরস্থানের কবরখোদক আলমগীর আরও বলছিলেন, ‘সেদিন তো জানি না ওটা নূর হোসেনের লাশ ছিল। পরে জানতে পারি, ওই দেয়ালের পাশের কবরটিই হলো শহীদ নূর হোসেনের।’

গতকাল ৯ নভেম্বর (১৯৯৩) সকালে শহীদ নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমানকে নিয়ে আমি যখন জুরাইনের কবরস্থানে গিয়ে পৌঁছাই, তখন আলমগীরসহ কয়েকজন এগিয়ে এসে সেই রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তাঁদের দুঃখ, সময় পেলে কেরোসিন বা তার্পিন তেল দিয়ে ঘষে নূর হোসেনের বুকে-পিঠের লেখাগুলো তোলা যেত। কিন্তু সে সময়টুকুও ওরা দেয়নি। এমনই মানুষ ওরা।

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে তিন শহীদের মৃতদেহ নিয়ে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের গাড়ি এসেছিল এই কবরস্থানে। সঙ্গে এসেছিলেন পাঁচ-ছয় ট্রাক বিডিআর ও পুলিশ

সদস্য। এই তিন শহীদ—নূর হোসেন, নূরুল হুদা বাবুল আর শহীদুলের(?) মৃতদেহ কোনো রকমে কবর দেওয়ার পর শেষ রাতে তাঁরা চলে যান। তাঁদের তাড়াহুড়ো ছিল, চাপ দিচ্ছিলেন দ্রুত কবর দেওয়ার জন্য। সে জন্য পুরোপুরি ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী ওই তিনজনের লাশ দাফন করা যায়নি।

তাঁরা বলেন, খাটিয়ায় করে শহীদ নূর হোসেনের লাশ নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু শহীদ নূরুল হুদা বাবুলের লাশ নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে। শক্ত-সমর্থ ছিলেন তিনি। কবর পর্যন্ত নিয়ে যেতে দুবার খাটিয়া নামিয়ে রাখতে হয়েছিল।

কবরখোদক আলমগীর আর বাবুল দুজন মিলে বলেন, নূর হোসেনের চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিল। পরিষ্কার বোঝা যায়, রক্ত ঝরে মারা গেছে। ওর কোমরে গুলি লেগেছিল। বললেন, কোনো পোস্টমর্টেম করা হয়নি। সেটা করা হলে তো বুক ফাড়া থাকত।

জুরাইন কবরস্থানে সকালের বিষণ্ন পরিবেশে তাঁদের সেই রাতের অভিজ্ঞতার কথা, শহীদ নূর হোসেনের শেষকৃত্যের কথা শুনতে শুনতে বৃদ্ধ মজিবুর রহমান ডুকরে কেঁদে ওঠেন। শহীদ নূর হোসেনের কবরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে মোনাজাত করতে থাকেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া চান। আমরা দেখি, তাঁর দুই চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তে থাকে।

জুরাইন কবরস্থানের পরিচর্যাকারীরা জানান, এক বছর আগে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে দুই শহীদের কবরে বেড়া দিয়ে ছোট নামফলক টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহীদ নূর হোসেন আর নূরুল হুদার কবরের বেড়াগুলো এখন ভেঙে পড়েছে। আর শহীদুলের(?) কবরে কোনো কিছু নেই। এই শহীদের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

শহীদ নূর হোসেনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মজিবুর রহমান তাঁর কথা বলেন। তিনি কোনো একটি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারেন, জুরাইন কবরস্থানে নূর হোসেনের কবর হয়েছে। পরে ১৩ নভেম্বর তিনি সেখানে যান। সেদিন কবরখোদকেরা জানান,

তিনজনের মধ্যে একজনের মুখে দাঁড়ি ছিল, পায়ে কেডস জুতা, উদোম গতর, বুকে-পিঠে কী যেন লেখা ছিল। তখন তিনি নিশ্চিত হন যে, তিনিই হবেন নূর হোসেন। তিনি কবর খুঁড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। সাত দিন পরে একবার, এক মাস পর আরেকবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, সেদিন সবাই মিলে কান্নাকাটি করেছিলেন। তখনো তিনি জানতে পারেননি, কোনটি তাঁর প্রিয় সন্তান নূর হোসেনের কবর। আজ তিনি জানেন, তাঁর কবর কোনটি। কিন্তু তাঁর দুঃখ কোনো দিন যাবে না। তিনি বলেন, 'আমি আমার ছেলের লাশ শেষবারের মতো দেখতে পেলাম না। এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়। আমার কোনো শেষ স্মৃতি থাকল না। কী নিয়ে আমি বাঁচি?'

এর পরও শত দুঃখ-বেদনা নিয়ে এই ঢাকা শহরে তিনি বেঁচে আছেন। মজিবুর রহমান বলেন, 'আমার মানিক, নূর হোসেন "স্বৈরাচার নীপাত যাক" আর "গনতন্ত্র মুক্তি পাক" স্লোগান বুকে-পিঠে নিয়ে প্রাণ দিয়েছে।' সে জন্য তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন, ভালোবাসা পেয়েছেন। তবে তিনি সারাক্ষণ ভাবেন, নূর হোসেন তো কবরেও গেলেন সেই স্লোগান বুকে নিয়ে। কীভাবে, কবে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে?

প্রকাশকাল : ১০ নভেম্বর ১৯৯৩, *ভোরের কাগজ*

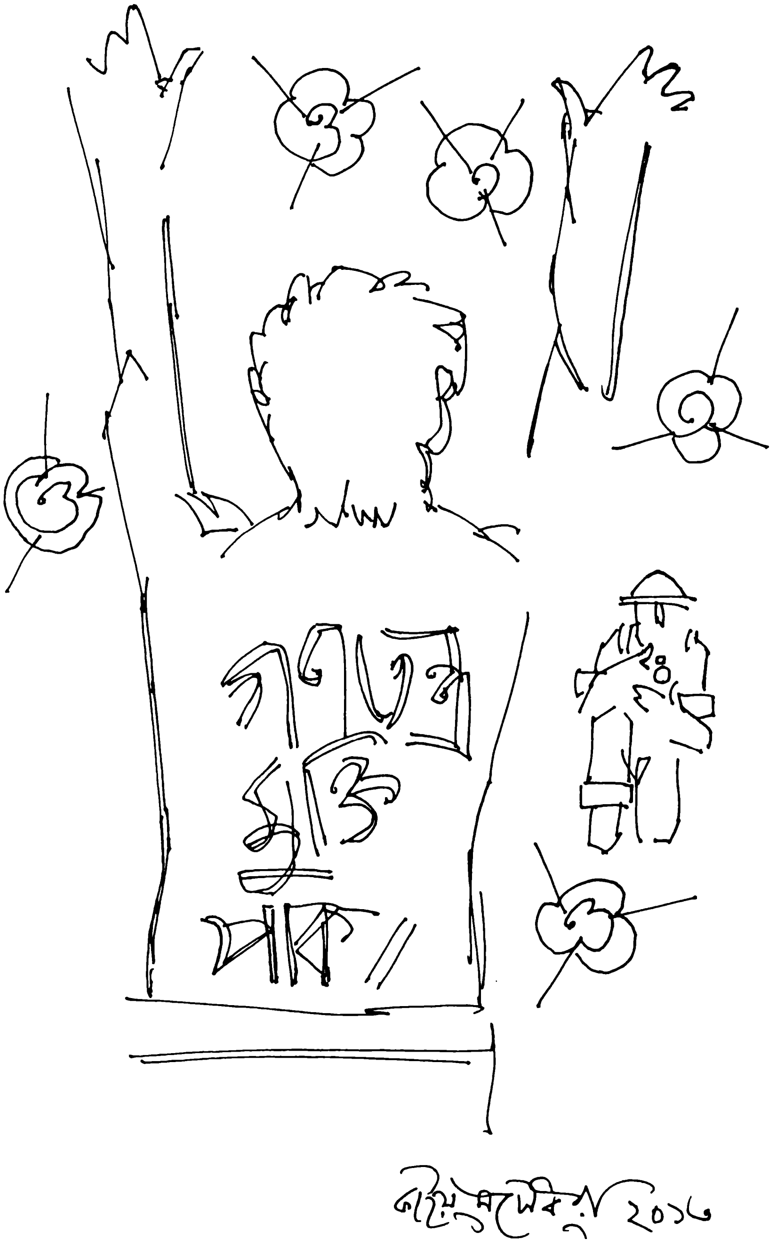

শহীদ নূর হোসেনের পিতার মৃত্যুর পর কিছু কথা

মতিউর রহমান

গত ৫ মার্চ, শনিবার গভীর রাতে, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা আর বুকের মধ্যে গভীর বেদনা নিয়ে নির্বাক মজিবুর রহমানের মৃত্যু হলো। ১৯৮৭ সালের গণ-আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর।

গত বছরের ১ আগস্ট (২০০৪ সালে) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসার পর গত ৩ নভেম্বর মিরপুরের বাসায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

আমরা গত বছরের ১০ নভেম্বর (২০০৪ সাল) শহীদ নূর হোসেনকে স্মরণ করে মজিবুর রহমানের গুরুতর অসুস্থতার খবর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে *প্রথম আলোয়* একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম। তারপর তাঁর মৃত্যুবরণের সংবাদ ছাপলাম ৭ মার্চ। আমরা জানতাম, তাঁর জীবন আর দীর্ঘ হবে না। তাঁর মৃত্যু প্রায় আসন্ন। তার পরও মজিবুর রহমানের মৃত্যুসংবাদ আমাদের গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।

মজিবুর রহমানের মৃত্যুর সংবাদ কোনো গুরুত্ব পায়নি টেলিভিশন বা দৈনিক সংবাদপত্রগুলোয়। অথচ একসময়, সেই গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ বছরগুলো এবং নব্বইয়ের শুরুতে শহীদ নূর হোসেন আর তাঁর পিতাকে নিয়ে কত না হইচই আর মাতামাতি হয়েছিল! কত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে সেই সময়ে স্বৈরাচারবিরোধী নানা সভা-সমাবেশে!

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বরে আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ২৪ বছরের যুবক নূর হোসেন। দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল। সারা দুনিয়ার সংবাদ হয়েছিলেন নূর হোসেন। নূর হোসেনকে নিয়ে কবিতা, গল্প আর নাটকও লেখা হয় অনেক। পোস্টারের বিষয় হন নূর হোসেন। আশির দশকের শেষ সময়ে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নূর হোসেন নতুন এক সাহস, এক প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন।

১০ নভেম্বর নূর হোসেনের আত্মদানের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবারও সংবাদ হয়ে উঠেছিল। দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকায় তাদের নিয়ে অসংখ্য খবর বের হয়। নূর হোসেনের পিতার অনেক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ছোট-বড় নানা রকম সভা-সমাবেশ, আলোচনা, এমনকি শহীদ মিনারে বুদ্ধিজীবীদের মস্ত বড় অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল। প্রচুর সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে। মজিবুর রহমান যারপরনাই খুশি ছিলেন সেই দিনগুলোয়। তখন তিনি গর্বিত হৃদয়ে পুত্রশোকের সান্ত্বনা খুঁজেছেন।

আমরা সবাই মিলে শহীদ নূর হোসেনের পিতামাতা এবং পরিবারের সবাইকে অনেক আশ্বাস দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, আমরা আছি, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আমরা স্বৈরাচারের পতন ঘটাব, গণতন্ত্রকে মুক্ত করব। আমাদের সে আশ্বাস, সে সাহসে শহীদ পরিবার আশ্বস্ত হয়েছিল সেদিন।

মজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত

আকস্মিক ও বড় বেদনাদায়ক। সাতাশির ২৮ নভেম্বর উয়ারী থেকে বেবিট্যাক্সিতে করে মণিপুরিপাড়ায় শিল্পী কামরুল হাসানের বাসা হয়ে বংশালে *সাপ্তাহিক একতা* অফিসের দিকে চলেছি। বেবিট্যাক্সি ইন্দিরা রোড হয়ে ফার্মগেট পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় ট্যাক্সিচালক চকিতে পেছন ফিরে আমাকে তাঁর পরিচয় দিলে আমি চমকে উঠি। মজিবুর রহমান তাঁর সন্তান নূর হোসেনের কথা বলেছিলেন। তিনি একটি ফটো চেয়েছিলেন নূর হোসেনের, সেটাকে বাঁধিয়ে রাখবেন বলে। গন্তব্যস্থল বংশালে নেমে সলজ্জিত বিমূঢ়তা কাটিয়ে তাঁকে সেদিন শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। আর ভাবছিলাম, আমরা শহীদদের কথা বলি, তাঁদের নামে শপথ নিই, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে, তাঁদের পরিবার সম্পর্কে কতটা খোঁজ রাখি?

শহীদ নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমানের সঙ্গে সেই আকস্মিক পরিচয়ের পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। দিনের পর দিন, সকাল-বিকেল-রাতে নানা সময়ে তিনি আমাদের উয়ারীর বাসায় উপস্থিত হতেন। বংশালের *সাপ্তাহিক একতা* অফিসে যেতেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর অফিসে গিয়ে গল্প করেছেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আর বেবিট্যাক্সি চালাতে পারতেন না। তার পরও যখনই দেখা হয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে আমাদের। তাঁর জীবনসংগ্রাম আর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার কথা শুনে মানুষ আর জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখেছি।

আমিও মজিবুর রহমানের বাসায় গিয়েছি অনেক—কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে। এই যাওয়া-আসার মধ্যে নূর হোসেনের মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, দিন দিন আমরা ঘনিষ্ঠতর হয়েছি। তাঁদের দুঃখ-বেদনাকে কিছুটা হলেও ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। মজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ ভেবে বড় চিন্তিত ছিলেন তিনি। তাঁর বড় ছেলে আলী হোসেনের একটি

চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম বেসরকারি এক ব্যাংকে। পরে অবশ্য আলী হোসেন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব গাড়িচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এখনো তিনি সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৬-২০০১) হলে মিরপুরের মাজার রোডে পাঁচ কাঠা পরিমাণ একটি ডোবা জমি পেয়েছিল মজিবুর রহমানের পরিবার। সেখানে ধীরে ধীরে কোনো রকমে একটি বাসা করেন তাঁরা। এখন শহীদ নূর হোসেনের ভাইবোন সবাই একসঙ্গে থাকেন। ভাই আর ভগ্নিপতিরা নানা পেশায় যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এসব দেখে-জেনে ভালো লাগে।

মজিবুর রহমানের কুলখানিতে (মঙ্গলবার, ৮ মার্চ) উপস্থিত হয়ে শহীদ নূর হোসেনের মা ও ভাইবোনের সঙ্গে অনেক কথা হলো। মা অনেক কান্নাকাটি করে পুরোনো অনেক কথা বললেন। তাঁর সন্তানদের স্ত্রী ও স্বামী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁদের কাছ থেকে মজিবুর রহমান সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানলাম। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখতেন মজিবুর রহমান। ওই টেলিভিশনের ঠিক ওপরে ঝোলানো রয়েছে শহীদ নূর হোসেনের মৃত্যুর আগমুহূর্তের স্লোগানরত ছবিটি, বুকে লেখা 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' আর পিঠে লেখা 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক'।

সাতাশির ১০ নভেম্বর বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' আর 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে হাজারো মানুষের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় নেমেছিলেন শহীদ নূর হোসেন। তারপর পুলিশের লক্ষ্যভেদী গুলিতে বনপাখির মতো লুটিয়ে পড়েছিলেন রাজপথে। পরবর্তী সময়ে শহীদ নূর হোসেন স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলনের এক উজ্জ্বল পতাকা হয়ে ওঠেন।

কিন্তু নূর হোসেনের লাশ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট খবর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। শুধু জুরাইনের গোরস্থানে তাঁর কবর হয়েছে বলে

কোনো কোনো পত্রিকায় খবর বের হয়েছিল। এ খবর শুনে নূর হোসেনের পিতা ১৩ নভেম্বর ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। জুরাইনের কবরখোদকেরা তাঁকে জানিয়েছিলেন, ১২ নভেম্বর শেষ রাতে—সময় রাত তিনটা হবে—পুলিশের তত্ত্বাবধানে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের গাড়িতে করে তিনটি লাশ আনা হয়েছিল। লাশ তিনটির মধ্যে একটির মুখে ছিল দাড়ি। পায়ে কেডস জুতা। উদোম গতর। বুকে-পিঠে কী যেন লেখা ছিল।

মনে পড়ে, সে সময় নূর হোসেনের পিতার করুণ আর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিল আমাদের প্রতি, 'সত্যি কি নূর হোসেনের কবরের খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন ছিল? আপনারা চেষ্টা করলে কি এটা সম্ভব ছিল না?' আমার কাছে তো এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের সুবিধা হয় এমন বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য বারবার নানা প্রলোভন দেখিয়ে মজিবুর রহমানকে একাধিকবার প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। সেসব প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কী বিরল চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন বেবিট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমান! তাঁর কাছ থেকে বিবৃতি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে নষ্ট করে তাঁকে হেয় করতে চেয়েছিল স্বৈরাচারী সরকার।

দেশ ও দেশের মানুষের জন্য মজিবুর রহমানের এই ভালোবাসা ও মঙ্গল-কামনারও সুদীর্ঘ অতীত আছে। তাঁর এই মানবকল্যাণবোধ গড়ে ওঠার ইতিহাসও বাংলাদেশের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের ঘটনাবলির সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সব আন্দোলনের উত্থান-পতনের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

বেবিট্যাক্সিচালক মজিবুর রহমান চার দশক ধরে ঢাকায় থেকে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে, তিন দশকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির

উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এক দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি কখনোই কারও দ্বারে, কোনো দলের কাছে সাহায্য নিতে বা কোনো সুবিধার জন্য হাত পাতেননি। এটা ছিল তাঁর জন্য এক বড় গর্ব। পুত্র নূর হোসেনের মহান আত্মত্যাগ বেবিট্যাক্সিচালক পিতাকে আরও সাহসী উদ্দীপ্ত করেছিল। পুত্র হারানোর শোকে গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন, কিন্তু আশাবাদ তাঁকে আরও দৃঢ় করেছিল। দেশের মঙ্গলচিন্তা তাঁকে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি ভাবিয়ে তুলত।

এভাবেই বিগত চার দশকের শত সংগ্রামে পোড়খাওয়া এক প্রবীণ প্রজন্ম বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, শ্রমিক-বস্তিতে, খেতমজুরের আস্তানায় গড়ে উঠেছে। সারা দেশে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতে এই কয়েক দশকের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নূর হোসেনের মতো সাহসী এবং আত্মত্যাগে উন্মুখ এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়ে চলছিল।

নূর হোসেন শহীদ হওয়ার দু-তিন বছর পর শুধু নয়, স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর দেড় যুগ ধরে সভা-সমাবেশ অনেক হলো। হরতালও কম হলো না। কত মানুষের মৃত্যু হলো, সরকার এল, সরকার গেল। কিন্তু তেমন তো বড় কোনো পরিবর্তন হলো না সাধারণ মানুষের জীবনে। এক সরকারের জায়গায় আরেক সরকার এসেছে। নিজেদের পছন্দমতো নীতি নিয়ে চলেছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, দলীয়করণ, আত্মঘাতী রাজনীতি, কোনো কিছুই প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মনে পড়ে, মজিবুর রহমান প্রায় এক দশক আগে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে? চারদিকে বেড়া দিয়ে আটকানো গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে। তিনি শেষ পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার কয়েক দিন আগেও বড় ছেলে আলী হোসেনকে দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘নূর হোসেন যা চেয়েছিল, তা তো হলো। স্বৈরতন্ত্র নিপাত হলো। এখনো দেশে এত

হানাহানি, সন্ত্রাস। গণতন্ত্র তো মুক্তি পেল না।' এর চেয়ে সত্যি কথা আর কী হতে পারে? স্বৈরতন্ত্রের পতন হলো, একের পর এক নির্বাচন হলো। আর আমরা পাচ্ছি একের পর এক নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। এটাই কি আমাদের ভাগ্য? আমাদের নিয়তির লিখন?

শয্যাশায়ী মজিবুর রহমান যখন কাউকে চিনতে পারতেন না, কথা বলতে পারতেন না, তখনো নূর হোসেনের বাঁধানো ছবিটা তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তাঁর চোখে দেখা দিত গভীর বেদনার ছায়া। পরম মমতায় হাত বোলাতেন ছবিতে। আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইতেন ছবিটা। শহীদ নূর হোসেনের ছবিটা যেন ছিল তাঁর বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন।

শহীদ নূর হোসেনের পিতা মজিবুর রহমানের প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা।

প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০০৫, *প্রথম আলো*

২০১৬

পরিশিষ্ট

নূর হোসেনের পিতার বেঁচে থাকাই দায়

নিজস্ব প্রতিবেদক

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বিরোধী দলের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে মাঠে নেমেছিল এক জীবন্ত পোস্টার। ২৪ বছরের টগবগে যুবক নূর হোসেন বুকে 'স্বৈরাচার নীপাত যাক' আর পিঠে 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' স্লোগান লিখে মিছিলে সবার সামনে ছিলেন। চোখের সামনে এমন প্রতিবাদী পোস্টার সহ্য করতে পারেনি স্বৈরাচারী এরশাদের পুলিশ বাহিনী। তাদের হাতের লক্ষ্যভেদী বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় নূর হোসেনের বুক, কবি শামসুর রাহমান যাকে অভিহিত করে গেছেন 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' বলে।

নূর হোসেন শারীরিকভাবে মারা গেলেও ১৯৮৭ সালের পর থেকে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীলসহ সব আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় বাবা মজিবুর রহমানের বেঁচে থাকাই এখন দায় হয়ে গেছে। একাত্তর বছর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে (ব্রেইন স্ট্রোকে) এখন তিনি শয্যাশায়ী। পক্ষাঘাতগ্রস্তের সঙ্গে যোগ হয়েছে যক্ষ্মা। নূর হোসেনের বাবা এখন সারা দিন শুয়ে থাকেন। কোনো কথা বলতে পারেন না। কাউকে চিনতেও পারেন না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। নূর হোসেন তাঁর বাবাকে খুব ভালোবাসতেন।

পরের দিন অভিনব প্রতিবাদের যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তার উত্তেজনায় ১৯৮৭ সালের ৯ নভেম্বর রাতে বাসায়ই ফেরেননি নূর হোসেন। সে রাতেই বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে ঘুমিয়ে ছিলেন নির্মাণাধীন ডিআইটি মসজিদের দোতলায়। কিন্তু নূর হোসেনের মা-বাবা আশঙ্কা করছিলেন, ১০ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে অনেক গন্ডগোল

হবে। আর এ ধরনের কর্মসূচিতে সবার আগে থাকেন নূর হোসেন। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ফজর নামাজ পড়েই বনগ্রাম লেনের বাসা থেকে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন নূর হোসেনের খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা মসজিদের দোতলায় ঘুমন্ত নূর হোসেনকে দেখতে পান। ডাক শুনেই চমকে জেগে ওঠেন নূর হোসেন। দ্রুত একটি চাদর গায়ে দিয়ে উঠে আসেন। চাদর গায়ে দিয়েছিলেন আসলে মা-বাবার কাছ থেকে বুকে-পিঠের স্লোগান আড়াল করতে। কিন্তু মায়ের চোখ ফাঁকি দিতে পারেননি তিনি। নূর হোসেন খুব ফুটবল খেলতেন, নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। মা যখন জানতে চাইলেন, বুকে-পিঠে কী লেখা? নূর হোসেনের জবাব ছিল, ফুটবল ম্যাচ আছে, তার জন্য লেখা।

গতকাল মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) মিরপুর মাজার রোডের বাসায় নূর হোসেনের মা মরিয়ম বিবি সেই সময়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগাক্রান্ত হয়ে বলেন, 'আমরা বলেছিলাম, বাবা, আজকে অনেক গন্ডগোল হবে। তুই মিছিলে যাসনে। এখন আমাদের সঙ্গে বাসায় চল।' নূর হোসেন বলেছিলেন, 'ভয় পেয়ো না। কিছু হবে না। তোমরা যাও, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। মিছিলে গেলেও আমি সবার পেছনে থাকব।' মরিয়ম বেগম বললেন, 'নূর হোসেন তার বাবাকে খুব ভালোবাসত। সেদিন বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে অনেক আদর করেছিল। পাশে বসিয়ে আপেল খাইয়েছিল। তারপর গুলিস্তানের কামান পর্যন্ত এসে আমাদের রিকশা ঠিক করে দিয়েছিল।'

সেদিন মিছিলে গিয়েছিলেন নূর হোসেনের বড় ভাই আলী হোসেনও। মিছিলে সবার আগে ছোট ভাইকে দেখে বাসায় ফিরে মায়ের সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছিলেন, 'তোমরা তাকে আনতে পারলে না! তোমার ছেলে সবার সামনে যেভাবে বুকে-পিঠে স্লোগান লিখে মিছিল করছে, কী হয় কে জানে!' মরিয়ম বিবি ঘরে নূর হোসেনের বাঁধানো ছবি দেখিয়ে বলেন, 'দেখেন বাবা, নূর হোসেনের মুখে কী রকম রাগের চিহ্ন! এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তার অনেক রাগ ছিল। তার অগ্নিমূর্তি দেখে আলী হোসেনও তাকে ডাকার সাহস পায়নি।'

শহীদ হওয়ার কয়েক দিন আগে নূর হোসেন তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'আমি একটা কিছু করার চেষ্টা করছি। মা, তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না। আমাকে সবাই চিনবে।' নূর হোসেনকে এখন সবাই চেনে। আর্থিক কষ্টও অনেকটা ঘুচে গেছে। বনগ্রাম রোডের বাসা ছেড়ে মিরপুরের

মাজার রোডে সরকারের দেওয়া জমিতে টিনশেড বিল্ডিংয়ে উঠে এসেছে নূর হোসেনের পরিবার। কিন্তু নূর হোসেনই যে আর নেই!

অন্যরা যা-ই হোক, নূর হোসেনের বাবা মজিবুর রহমান এত দিন বেঁচে ছিলেন বীর সন্তানের স্মৃতি নিয়েই। সব সময় ছেলের গল্প করতেন। বিভিন্ন সভা-সমিতির বক্তৃতায় ছেলের কথা বলতেন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলতেন। এরশাদ ১৯৯৬ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে নূর হোসেনের বাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁর খরচের জন্য মাসে মাসে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিছুদিন টাকা দিয়েও ছিলেন। কিন্তু এরশাদের টাকায় ভোলেননি মজিবুর রহমান। এক সভায় তাঁকে স্বৈরাচারী বলায় এরশাদ চিঠি লিখে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। এ নিয়ে তাঁর পরিবারের কোনো ক্ষোভ নেই। বরং তাঁরা নিজেদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট।

গত ১ আগস্ট মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন মজিবুর রহমান। প্রথমে তাঁকে কমফোর্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। সেখানে দুই দফা চিকিৎসা শেষে গত ৩ নভেম্বর তাঁকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন, এখন আর তাঁদের কিছু করার নেই। বাকিটুকু নিয়তি।

অসুস্থ হওয়ার কয়েক দিন আগেও মজিবুর রহমান বড় ছেলে আলী হোসেনকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ছেলেটা যা চেয়েছিল, তা তো হলো না। এখনো দেশে এত হানাহানি, সন্ত্রাস!' শয্যাশায়ী মজিবুর রহমানের এসবে আর কিছু যায়-আসে না। কাউকেই চিনতে পারেন না তিনি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ভাবলেশহীন চোখে। তাঁর স্মৃতিকে উসকে দিতেই নূর হোসেনের বাঁধাই করা একটি ছবি ধরা হয় তাঁর সামনে। মা মরিয়ম বিবি পাশে বসে দেখিয়ে দেন নূর হোসেনকে। এমনিতে কাউকে চিনতে পারেন না মজিবুর রহমান। কিন্তু প্রিয় সন্তানের ছবি দেখেই সেই চোখে খেলা করে আনন্দ-বেদনার ছায়া। নূর হোসেনের ছবিতে পরম মমতায় হাত বোলাতে থাকেন তিনি। স্মৃতিকে আরেকটু নাড়া দিতে দিতে এ প্রতিবেদক সেই ছবিটি নিয়ে আসতে চাইতেই দুর্বল দুই হাতে আঁকড়ে ধরেন সেটি। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকু ছাড়তে রাজি নন মজিবুর রহমান—দেশের শ্রেষ্ঠ একজন সন্তানের মৃত্যুপথযাত্রী পিতা।

প্রকাশকাল : ১০ নভেম্বর ২০০৪, *প্রথম আলো*